মিত্রালয়
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

আড়াই টাকা

লেখকের অন্যান্য বই

●

নক্‌শা

সার্কাস

কথায় কথায়

স্বর্গ যদি কোথাও থাকে

এই কলকাতায়

মেঘনামতী

মিত্রালয় ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২, হইতে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক
প্রকাশিত ও অরবিন্দ সরদার কর্তৃক শ্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৮।৩, চিন্তামণি
দাস লেন কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।

নাচের পুতুল কেতু
সব করে সে সব পারে
তেমন তেমন লাফ মারে সে নাচে
লড়াই করে বড়াই করে
হাসে কাশে নানান ধাঁচে
যেমন যেমন টান পড়ে তার পরে

নাচের পুতুল ডিগবাজী খায়
লোককে হাসায়
আছাড় খেয়ে লোককে হাসায়
ভেংচি মেরে লোককে হাসায়
নিজের নাক কাটে আর পরকে হাসায়
হাত তালি পায় কেতু
বাজারে তার নাম বেড়ে যায়
দাম বেড়ে যায়
কেতুর তারে টান বেড়ে যায়
সকলে তাই এই খেলা চায়
এই খেলা তাই আবার দেখায় কেতু
আবার দেখায় আবার দেখায়
আবার দেখায়

শ্রীকানাইলাল সরকার

সহৃদয়েষু—

কানাইদা,

নাচের পুতুল সরকারীভাবে রূপদর্শীর শেষ বই। আপনি রূপদর্শীর একজন স্রষ্টা, তাই তাঁর শেষ বইখানি রূপদর্শী আপনাকেই উৎসর্গ করছেন।

রূপদর্শী আসরে নেমেই হাততালি পেলেন। রাজা থেকে রাজপেয়াদা সবাই তাঁর পিঠ থাবড়ালেন। সম্পাদক, প্রকাশক, পাঠক—সব্বাই আহা আহা বাহা বাহা করলেন। 'রূপদর্শী'র প্রাণ পুলকের পাখায় ভর করে ফরফর করে উড়তে লাগল। ভাবলেন, আহা, কি হনু রে।

হয়ত, এই স্বর্গেই রূপদর্শীর চিরটা কাল কাটত। কাটত পৃষ্ঠপোষকদের স্নেহ কুড়িয়ে, পাঠকের হাততালি কুড়িয়ে, সম্পাদকের অভয় আর প্রকাশকের দাদন কুড়িয়ে। কিন্তু তবুও রূপদর্শী তাঁর পড়তার বাজারের মাথায় গাঁট্টা মেরেই কেটে পড়লেন।

রূপদর্শী এক অর্থে সফল লেখক। তাঁকে লেখার জন্যে ভাবতে হয়নি, গড়গড়িয়ে লেখা এসেছে তাঁর। লেখা ছাপার জন্যে ভাবতে হয়নি। নামজাদা কাগজের সম্পাদকরা কখনো তাঁকে বিমুখ করেন নি। প্রকাশকরা তাঁর পাণ্ডুলিপি পড়ে পর্যন্ত দেখেন নি (তোমার লেখা আর পড়ব কি ভাই, ও বাজারে ছাড়লেই বিক্রি, মুড়ি-মুড়কির মত বিক্রী, এতো জানা কথা) চেক কেটে দিয়েছেন। যে লেখা মগজে আছে, তার জন্যও দাদন দিতে চেয়েছেন। লেখক-জীবনে এর চেয়ে আর বেশী কি চাই?

কিন্তু তবু, রূপদর্শী বিদায় নিচ্ছেন। স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে এবং স্ব-জ্ঞানে।

কারণ? এ নাচ নাচতে আর তাঁর ভাল লাগছে না।

ঢাক ঢোলের বাদ্যে যখন চতুর্দিক সরগরম, সেই হট্টগোলে রূপদর্শীর একদিন নজর পড়ল নিজের দিকে। দেখলেন তিনি নাচছেন। থামতে চাইলেন, পারলেন না। একী? থামতে পারছেন না কেন? কি ব্যাপার? দেখলেন, কোন অজান্তে তাঁর পিঠে তারের বাঁধন পড়ে গেছে। সেই তারের গোড়া ধরে তাঁকে নাচানো হচ্ছে। রূপদর্শী দেখলেন, তিনি নাচছেন, সম্পাদক নাচাচ্ছেন, প্রকাশক নাচাচ্ছেন, স সার তাকে নাচাচ্ছে। তিনি লিখছেন না, তাঁকে লেখানো হচ্ছে। নিজের জন্য নয়, পাঠকের জন্য, পাঠকের মনে সুড়সুড়ি দেবার জন্য।

সব থেকে তাজ্জব, সব থেকে আশ্চর্য, সব থেকে আফশোস, রূপদর্শী নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন। রূপদর্শীর মনটাই এমন তৈরী হয়ে আছে যে তাঁর আঙুল দিয়ে সুড়সুড়ি ছাড়া আর কিছু দেওয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু আর সুড়সুড়ি নয়, এবার তাঁর খামচি মারার ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু রূপদর্শীর এ আঙুল দিয়ে তা সম্ভব নয়। তার জন্যে এক নতুন জন্ম চাই।

তাই 'নাচের পুতুলে' রূপদর্শী তাঁর নাচ খতম করছেন। প্রণাম। ইতি মহালয়া ॥ ১৩৬২ ॥

রূপদর্শী

মাকালুজয়ী এক ফরাসী

"না, মসিয়, খুবই দুঃখিত, মসিয় বাদবেতো বাসায় নেই।" বামাকণ্ঠের উত্তর পেলাম।

মহা ঝামেলায় পড়লাম তো! মাকালু বিজয়ী ফরাসী অভিযাত্রী দলের কলকাতায় পৌঁছাবার কথা। পৌঁছাবার কথা কি, এতক্ষণে নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে। কোথায় উঠেছে, কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানিনে।

আমার [illegible] কর্ণধার, কলকাতার ফরাসী কনস্যুলেটের ডেপুটি কনসাল মসিয় বাদবেতো, তার আর পাত্তা পাচ্ছিনে কিছুতেই। দিন কয়েক আগেও তার সঙ্গে দেখা। সেদিন কলকাতার ফরাসী কনসাল মাকালু বিজয়ীদের সম্মান জানাবার জন্য তাঁর অফিসে এক পার্টি দেন। সেখানেই মসিয় বাদবেতোর সঙ্গে পাকা কথা হয়ে গেল। ফরাসী অভিযাত্রী দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই শুনে খুব খুশী।

"নিশ্চয়ই মসিয়, এ আর বেশী কথা কি। একুশ তারিখে (জুন) একটা ফোন করবেন আমাকে। মসিয় জাঁ ফাঙ্কো (এই ফরাসী দলটির নেতা) কাল দার্জিলিং যাচ্ছেন, ডাঃ ইভান্স (কাঞ্চনজঙ্ঘা বিজয়ী বৃটিশ অভিযাত্রী দলের নেতা) আর মসিয় তেনজিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে।" মসিয় বাদবেতো এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললেন। তারপর একটু থেমে, একটু হেসে, আবার বললেন, "২১শে ওরা কলকাতায় ফিরবে, ২৩ তারিখে ফ্রান্সে রওনা দেবে। কাজেই একটু সময় পাওয়া যাবে। ২১ তারিখে একটা ফোন

করবেন। কেমন? আমার অফিসে, কেমন? আচ্ছা গুড্ নাইট!"

সেদিন এই পর্যন্ত। কিন্তু একুশ তারিখে কথামত ফোন করে একবারে ডাহা বোকা বনে গেলাম। তিনটের সময় ফোন করলাম, "হ্যালো, ফরাসী কনস্যুলেট? অ্যাঁ, কি বললেন, বন্ধ? অফিস ছুটি হয়ে গেছে? সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত খোলা থাকে? ও, আচ্ছা, ধন্যবাদ। ও, হাঁ, শুনুন এই মাকালু বিজয়ী দলটি কি কলকাতায় ফিরেছে? ফিরেছে। যাক্ বাঁচালেন। আচ্ছা, ও'রা কোথায় উঠেছেন, জানেন?"

"না, মসিয়ঁ, খুবই দুঃখিত।" অপারেটর জবাব দেয়।

যাচ্চলে, একটু আলো যদিও ঝলক মারল, তা তারও গেল খেই ছিঁড়ে।

মরীয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করলাম, "হ্যালো, মসিয় বাদবেতাকে কি বাসায় পাব?"

অপারেটর জবাব দিল, "আমাব পক্ষে বলা মুশকিল, তবে একবার চেষ্টা করে দেখুন না।"

কিন্তু মসিয়ঁ বাদবেতা বাসাতেও নেই।

হতাশ হয়ে দোসরা উপায় ভাবছি এমন সময় ফোন বাজল।

"হ্যালো, আরে মসিয়ঁ বাদবেতা! নমস্কার, নমস্কার। কোথায় আপনি? আফিসে? সে কি, তবে না আফিস ছুটি হয়ে গেছে। আমার জন্যেই এসেছেন? ধন্যবাদ।"

মসিয়ঁ বাদবেতাই হদিশ দিলেন ওদের। হোটেলের নাম জানালেন। বললেন, "তবে, আমার যতদূব বিশ্বাস, মসিয় ফ্রাঁকোকে পাবেন না আজ। তবে মঁ তেরেইকে পাবেন, মঁ কুজিকে পাবেন, আর সবাইকে পাবেন। আচ্ছা নমস্কার।"

॥ ২ ॥

হোটেলের যে স্থইটে মাকালু বিজয়ী ফরাসী অভিযাত্রীরা বাসা নিয়েছেন, সে তল্লাটে ঢুকতেই যার সঙ্গে মুখোমুখী, ইংরেজী তাঁর কাছে গোমাংস। নিজেই আমি হাসলাম। তিনিও হাসলেন। তিনি নমস্কার করলেন। আমি ফেরতাই দিলাম। তার পর কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি (অবিশ্যি ভাব বিনিময়ের) চলবার পর আমি বুঝলাম, তাঁর কাছে নয়, পর পর দুখানা কামরা ছেড়ে ডানহাতি কামরাখানায় ঢুকলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। ইংরেজি জাননেওয়ালা একজন সেই ঘরে আছে।

কামরার দরজায় টোকা পড়তেই টকটকে মুখ উঁকি দিল। তারপর দরজা একটু ফাঁক হল। একখানা মোলায়েম হাসির সঙ্গে আহ্বান এল, আস্থন, "আস্তাজ্ঞা হোক।"

ঘরের ভেতর জিনিসপত্রে ছত্রখান। প্যাকিং বাক্স, চামড়ার তোরঙ্গগুলোর কিছু হাঁ করে ভরপেট বাতাস নিচ্ছে, কিছু দ্বিধায় পড়ে ভাবছে, এই বিদেশী গাঁয়ে উঁকি মারব কি মারব না। আর কিছু বড় গম্ভীর। মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই পেটের মধ্যে কি আছে।

সেই ঘরে দুজন। এবং উভয়েই সুজন। অমায়িক হেসে বসতে বললেন। দেখে মনে হ'ল, কলকাতার এই বর্ষাটে গরমে ওদের একেবারে বেহাল করে ছেড়েছে। পরনে শুধু আণ্ডারওয়্যার আর মুখে বরফ-ছোঁয়া পানীয়।

"আমি তেরেই। আর ও—" বলে মসিয়ঁ তেরেই তাঁর

সঙ্গীর দিকে ফিরলেন। সঙ্গীটি একমনে গালে সাবান ঘসছেন আর শিষ দিয়ে সুর ভাঁজছেন। "ও হল কুজি, মসিয়ঁ জঁা কুজি।"

মসিয়ঁ কুজির সাবান মাখানো দাড়ির বুরুশ একটুক্ষণ থামল। সুর ভাঁজা থামল না। চকিতে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে, একটু মাথা নুইয়ে আবার নিজ কাজে মন দিলেন।

"আমি আর কুজিই প্রথম মাকালু শীর্ষে চড়েছি।" মসিয়ঁ তেরেইয়ের মুখে খুশীর আভা ছড়িয়ে পড়লো।

"মাকালু বিজয়ের বিবরণ জানতে চান? তা, আমার স্মৃতিশক্তি তো তেমন খর নয়। আমাদের নেতা মসিয়ঁ ফ্রাঁকোর সঙ্গে দেখা করলেই ভাল করতেন। তিনি সুন্দর করে গুছিয়ে সব বলতে পারতেন।" মসিয়ঁ তেরেই এক ঢোক ঠাণ্ডা অরেঞ্জ (মদ নেই। সেদিন শুকনো দিন।) পান করে গলা ভেজালেন। তারপর বললেন, "কিন্তু আফসোস, তাঁকে পাওয়া যাবে না। মসিয়ঁ ফ্রাঁকো বড় ব্যস্ত।"

বললাম, "মসিয়ঁ ফ্রাঁকোর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। দার্জিলিং যাবার আগে, ফরাসী কনস্যুলেটের এক পার্টিতে কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। তাঁর কথা নয়, আপনার কথাই শুনতে চাই।"

"ধন্যবাদ মসিয়ঁ।" মসিয়ঁ তেরেই হাসলেন। বললেন, "পাহাড়ে চড়া এক কথা, আর তার গল্প শোনানো আরেক কথা। দুটো কাজ সমানভাবে হাসিল করা পয়লা নম্বরের ওস্তাদি। অত ক্ষমতা আমার নেই। মোটামুটি বলে যাই। শুনুন।

"এবারে বড্ড তাড়াহুড়ো করে আমাদের আসতে হয়েছে। এমনই তাড়া যে, নতুন জিনিসপত্র জোগাড় করবার সময়ও আমরা

পাই নি। ঐ গত বছর যে সব জিনিস এনেছিলাম, এবারকার বেশীর ভাগ জিনিসই তার মধ্যে থেকে বেছে আনতে হয়েছে। কি করব? গত বছর মাকালু থেকে ফিরলামই তো নভেম্বরে। ২০শে অক্টোবর (১৯৫৪) মসিয়ঁ ফ্রাঁকো মাকালুর দ্বিতীয় শৃঙ্গে উঠেছিলেন।"

বললাম, "সঙ্গে আপনিও তো ছিলেন। আপনারা দুজনেই তো উঠেছিলেন।"

মসিয়ঁ তেরেই হাসলেন। বললেন, "মনে আছে দেখছি। সেবারে খুব কড়া কম্পিটিশন ছিল। একটা কালিফোর্নিয়ার দল ছিল। হিলারী আরেকটা দল এনেছিলেন। আর আমরা এসেছিলাম।"

কালিফোর্নিয়ার যে দলটি গত বছর মাকালুতে এসেছিল, তার নেতৃত্ব করেছিলেন এক পদার্থবিদ্, ডাঃ উইলিয়াম এ সিরি। তাঁর দলে দশজন অভিযাত্রী ছিল। অক্সিজেন ছাড়াই ওঠা যায় কিনা ওরা দেখতে চেয়েছিলেন। তেইশ হাজার ফিট পর্যন্ত উঠেওছিলেন। তারপর আর না। নেমে আসতে বাধ্য হলেন।

অক্সিজেন ছাড়া হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গগুলোতে ওঠা কি সম্ভব? এভারেস্টে অক্সিজেন না নিয়ে কেউ কি উঠতে পারে না?

ফরাসী কনস্যুলেটের পার্টিতে মসিয়ঁ ফ্রাঁকোকে কয়েকজন প্রশ্ন করেছিলেন। মসিয়ঁ ফ্রাঁকো বলেছিলেন, একেবারে অসম্ভব বলি কি করে। অক্সিজেন না নিয়ে ওঠা হয়তো যায় কিন্তু সে গোঁয়ার্তুমি করার কি কিছু মানে হয়? আপনাকে হিমালয় অভিযানে আসতে হলে বিশেষ ধরনের পোষাক পরিচ্ছদ, জুতো, খাদ্য সবই যখন আনতে হবে, তখন বেচারা অক্সিজেনকেই বা হরিজন করে রাখা কেন! অক্সিজেনও তো খাদ্যই।

মসিয়ঁ তেরেইও বললেন, "অক্সিজেনের সর্বাধুনিক বোতলই সর্বপ্রথম অজেয় হিমালয়ের দম্ভ চূর্ণ করে। এখন হিমালয়ের রহস্য জানা হয়ে গেছে আমাদের। অক্সিজেন সঙ্গে নাও। হিমালয়ের উচ্চস্তরের জলবায়ুর সঙ্গে মোলাকাত কর। সইয়ে নাও নিজেকে। শেরপাদের কর্মশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে যাতে, তাদের সেইভাবে কাজে লাগাও। ব্যস্, হিমালয় তোমার কাছে নতি স্বীকার করবে। সংগঠন, মজবুত সংগঠনই শুধু হিমালয়কে হারাতে পারে।

"আমরা যে দল নিয়ে গতবারে এসেছিলাম, এবারেও সেই দলই এনেছি। কাজেই হিমালয়ের হাল চাল আমাদের সকলেরই জানা ছিল। আর তা ছিল বলেই এবারে মাকালুকে এত সহজে জয় করতে পেরেছি। আর জয় বলে জয়, আর কোন অভিযাত্রী দলই বোধ করি আমাদের মত এমন গুষ্ঠিসুদ্ধ কোনও শিখরে ওঠে নি। সব মিলিয়ে উপরের দিকে আমরা ১৫ জন ছিলাম, ৮ জন ফরাসী ৬ জন শেরপা আর তাদের সর্দার। একে একে এই পনের জনই উঠেছে। একটা রেকর্ড থাকল আমাদের। কি বলেন ?"

গত বছর মাকালুতে ফরাসীরা যে অভিযান চালিয়েছিলেন, মসিয়ঁ জঁা ফ্রাঁকোই তার নেতৃত্ব করেছিলেন। এবারকার অভি-যানটিও তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে। ফ্রাঁকো ছাড়া আরও দশ জন ফরাসী অভিযাত্রী এই দলে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মসিয়ঁ জি ম্যায়োন, মসিয়ঁ জঁা বুডিয়ে, মসিয়ঁ এস কুপে, মসিয়ঁ এম ল্যাক্লিলে, ডাঃ পি বোর্দে, ডাঃ এ লাপ্রা, মসিয়ঁ ভিয়্যলেৎ, মসিয়ঁ এল তেরেই, মসিয়ঁ জঁা কুজি আর মসিয়ঁ পি ল্যরু। তার মধ্যে

পাঁচ জন ঝান্থু পাহাড়ে চড়িয়ে, পেশাদার গাইড। তেরেই আর কুজি অন্নপূর্ণা অভিযানেও এসেছিলেন। তেরেই বোধ করি, এই দলের মধ্যে সবচেয়ে বেপরোয়া। অন্নপূর্ণা অভিযানে অদ্ভুত কেরামতি দেখিয়েছেন। তিনজন নতুন এসেছেন। হিমালয়ে চড়া এই তাদের হাতেখড়ি। আর আছেন দুজন বৈজ্ঞানিক, ভূতাত্ত্বিক আর বাকিজন ড.ক্তার। ফরাসী দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিষদ ভূতাত্ত্বিক দুজনকে পাঠিয়েছেন। ফরাসী পর্বতারোহন ফেডারেশনের উদ্যোগে এই অভিযানটি .সংগঠিত হয়েছে। আব ফরাসী সাধাবণতন্ত্রের খোদ প্রেসিডেন্ট এর পৃষ্ঠপোষকতা করছেন।

"কিন্তু এত থাকতে মাকালুতে এলেন কেন ?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"তার কারণ, এখানে আসবার অনুমতি চটপট নেপাল সবকারের কাছ থেকে পাওয়া গেল। তাছাড়া বৃটিশরা কাঞ্চনজঙ্ঘায় চেষ্টা করছে। তবে ? মাকালু ছাড়া আব গতি কি ? মাকালু উচ্চতায় ২৭৭৯০ ফিট, পৃথিবীতে পঞ্চম। গতবার কালি-ফোর্নিয়ার দলটি দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে অভিযান চালিয়েছিল। ওদিক থেকে ওঠা খুব মুশকিল। বড় কষ্টসাধ্য পথ। হিলারীর অভিযান চলেছিল পশ্চিম আর উত্তর থেকে। এদিকের পথ ভালই হতে পাবে। অন্তত হিলারী তাই বলেছিলেন।"

কিন্তু ফরাসী অভিযাত্রীরা ও দুটো পথের একটিও অনুসরণ করলেন না। তাঁবা অনুসন্ধান চালালেন অন্য পথে। মাকালুতে ওঠবার সহজতব আর কোনও পথ পাওয়া যায় কি না ?

"সৌভাগ্যেব কথা, পথ আমরা পেলাম। অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে আমরা মাকালু 'কল' (২৬০০০ ফিট) পর্য্যন্ত পৌছে গেলাম।

ফ্রাঁকো আর আমি উঠেছিলাম মাকালুর দ্বিতীয় শৃঙ্গটাতে। শীত নেমে গেল। তুষারপাত, ঝড় শুরু হল। হিমালয়ের ক্রূরতম মূর্তির আবির্ভাবের সময় এসে গেল। তাই আমরা নেমে এলাম, ফিরে গেলাম দেশে।

"কিন্তু দেশে ফিরে বিশ্রাম নিতে পারিনি। কয়েকমাস পরেই আবার হাওয়াই পথে পাড়ি মারলাম ভারতে। সময় বাঁচানোর জন্য কলকাতা থেকে বিরাট নগর পর্যন্ত প্লেনেই গেলাম।

"তারপর সেখান থেকে হাঁটাপথে ধরমবাজার। ধরমবাজারে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল সর্দার গিলজেন। দার্জিলিং থেকে ১৫ জন 'বাঘা' (টাইগার) শেরপা সে নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। শোলো খুম্বু উপত্যকা থেকেও ১০০জন শেরপা কুলি এসেছিল। ওরা পাহাড়ের সুউচ্চ অঞ্চলে মাল বইতে ওস্তাদ। তার উপর আরও ২০০ নেপালী কুলি ধরমবাজার থেকে জোগাড় করা হ'ল। ওরা নিচু অঞ্চলে মাল বইবে। ২০শে মার্চ ১৯৫৫ আমরা ধরমবাজার থেকে যাত্রা করলাম মাকালুর উদ্দেশে।

"২০শে মার্চ রওনা দিলাম আর ৪ঠা এপ্রিল পৌঁছে গেলাম বেস ক্যাম্পে। ঠিক ১৬ দিনে। গত বছর এই পথটুকু যেতে আমাদের ২৪ দিন লেগেছিল। তা'হলেই আমাদের এবারকার তাড়াটা বুঝবেন। একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটা বলে না, তাই। অবিশ্যি এবারের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত আগের বারের চেয়ে ভাল ছিল।"

বেস ক্যাম্পে পৌঁছে, ২০০ নেপালী কুলিকে বিদায় দিতে হল। আর ওরা উপরে উঠতে পারবে না। ওদের মুরোদ এই পর্যন্তই। এবার মাল বইবে শেরপা কুলিরা।

"এই শেরপারা, বুঝলেন মসিয়ঁ", মসিয়ঁ তেরেই বললেন, "অদ্ভুত। একেবারে আশ্চর্য জীব। দেখে তাজ্জব বনে গেছি। ১৩ হাজার ফিট উপরে, বুঝে দেখুন, কি প্রচণ্ড শীত, ওদের ভ্রূক্ষেপও নেই তাতে। খালি পায়ে বরফের উপর দিয়ে দিব্যি মালের বোঝা পিঠে চাপিয়ে চলেছে। ওদের জন্য জুতো ছিল। দিতে গেলাম। নিল না।"

বেস ক্যাম্পে পৌঁছে ওঁরা দেখলেন, ও অঞ্চলে তখনও বেশ শীত। সারা বছর কাজকাম করে বাড়ি ফেরার আগে তাবৎ দেশের শীত যেন সেখানে মজুরী চুকিয়ে নেবার জন্য হাজির হয়েছে।

বেস ক্যাম্প থেকে ১নং ক্যাম্পে মাল চলাচল শুরু হল। সর্দার গিলজেনের উপর এই কাজের ভার পড়ল। আর সেই ফাঁকে অভিযাত্রীরা উঁচু উঁচু পাহাড়ে চড়ে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে লাগলেন।

ক্রমে ক্রমে শেরপারা বেস ক্যাম্প থেকে ১নং ক্যাম্পে মাল উঠিয়ে নিয়ে গেল। তারপর আরও উপরে উঠে ২নং ক্যাম্প স্থাপন করল। এরপর ২ জন অভিযাত্রী আরও উঁচুতে উঠে ৩নং ক্যাম্প বসালেন। সে ২জন ফিরে এলেন। তাঁদের বিশ্রাম করতে নির্দেশ দিয়ে ফ্রাঁকো দুইজন নতুন লোককে পাঠালেন ৪নং ক্যাম্প স্থাপন করতে। মাকালু কলের কাছাকাছি এই ক্যাম্প বসানো হ'ল। তারপর তারা দুজন নেমে এলেন।

মসিয়ঁ তেরেই বললেন, "পথ এরপর থেকে ক্রমশ খাড়া হতে লাগল। ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠল। বড় বড় বরফের চাঙড় ভেঙে পড়ছে কখনও। কোথাও বা তুষার-পাতের ফলে রাস্তাঘাটের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। আমরা চোখ কান,

কেন, সমগ্র ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম। হিমালয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, কঠিন সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল মানুষের। কী তীব্র বাতাসের গতি! কী তীক্ষ্ণ দাঁত বরফের! ফাঁক পেলেই যেন চিবিয়ে গুঁড়ো করে দেবে। তবু ভাল, আবহাওয়া বেঁকে বসে নি।"

পাহাড়েব গা খাড়া উঠে গেছে। শক্ত, নীল বরফের দেখা পেতেই অভিযাত্রীরা খুশী হলেন। শক্ত বরফে কাজের সুবিধে। সিঁড়ি কাটো আর উপরে ওঠো। বরফ কেটে সিঁড়ি বানানো শুরু হ'ল। ৯ই মে দুজন সারাদিন ধরে বরফ কাটলেন। আর দড়ি খাটালেন। এই সিঁড়ি আর এই দড়ি সম্বল করে পৌছাতে হবে। মাকালু কলে। মাল তুলতে হবে। ক্যাম্প খাটাতে হবে ৫নং ক্যাম্প। যে দুজন বরফ কাটছিলেন তাঁরা সেদিন আর ৪নং ক্যাম্পে পৌঁছাতেই পারলেন না। পরদিন দুজন তাজা লোককে পাঠানো হ'ল ওদের বদলি দিতে। সিঁড়ি কাটা হ'ল। দড়ি খাটানো হ'ল। তারপর সারাদিন (১০ই মে) ২৭ জন শেরপা মাল বয়ে নিল কলে। ৫নং ক্যাম্পও সেখানে খাটানো হ'ল।

১০ই থেকে ১৪ই, এই চারদিন একেবারে বেকার কেটে গেল। অভিযাত্রীরা ইঞ্চি খানেকও আর এগুতে পারলেন না। মাকালু কলের পর কিছুটা পথে বরফ নেই। একেবারে ঠকঠকে পাথর। সোজা উঠে গেছে। কাজেই এই চারদিন নতুন পথ খুঁজতেই খরচ হয়ে গেল।

এদিকে ৩নং ক্যাম্পে উঁচু চূড়ায় ওঠবার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে দুজন অভিযাত্রী আর ২১ জন শেরপা উঠে এলেন। তাঁরা দুদিন এখানে বিশ্রাম করলেন। তারপর এদের মধ্যে থেকে দুজন অভি-যাত্রী আর দুজন শেরপা কিছু কিছু মালপত্র নিয়ে একেবারে ৫নং

ক্যাম্পে উঠে গেলেন। হঠাৎ আবহাওয়া খারাপ হয়ে এল। তিনজন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একজন আবার একটু ভালও হয়ে গেলেন।

দুজন ফরাসী আর তিনজন শেরপা আরও উপরে উঠে গেলেন। তারপর সেইদিনই (১৪ই মে) ৬নং ক্যাম্প বসানো হ'ল। প্রত্যেককে অতিরিক্ত বোঝা বইতে হ'ল সেদিন। অক্সিজেনও টানতে হচ্ছিল। শুধু একজন শেরপা অক্সিজেনের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না রেখেই দিব্যি উঠে গেল।

"পরদিন (১৫ই মে) আমি আর মসিয়ঁ কুজি সকাল ৭॥টায় বেরিয়ে পড়লাম মাকালু শিখরের উদ্দেশে। বন্দোবস্ত তাই ছিল। আমরা দুজনেই অক্সিজেন টানছিলাম। আর ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলাম। আমরা এবারে পশ্চিমদিক থেকে মাকালুর উপর অভিযান চালিয়েছিলাম। এ পর্যন্ত মোটামুটি সেইদিক দিয়ে উঠছিলাম। কিন্তু হঠাৎ আমাদের উত্তরদিকে ঘুরে যেতে হ'ল। তাছাড়া চূড়ায় পৌছাবার কোন উপায় নেই।"

"আবহাওয়া খুব সুন্দর ছিল। আমি আর কুজি দুজনেই তো অন্নপূর্ণা অভিযানে এসেছিলাম। গত বছরও মাকালুতে এসেছি। কিন্তু এমন মনোরম মন জুড়ানো আবহাওয়ার সাক্ষাৎ আর কখনও পাই নি। তবে তাপমাত্রা সাংঘাতিকভাবে নেমে গিয়েছিল। প্রথম দিকে আমরা খাড়া উপরে উঠছিলাম, বরফের গা কেটে কেটে। বরফের অজস্র কার্নিশ ঝুলে আছে। ওগুলো যেন জমাট বাঁধা স্তব্ধতা। কি অপার্থিব স্তব্ধতা!

"বাতাস মোটে নেই। আকাশে বিন্দুমাত্র ময়লা নেই। মনে হ'ল আকাশটা কী পাতলা! কী স্বচ্ছ! যেন আর একটু উপরে উঠে আকাশের গায়ে উঁকি মারলেই এক অন্য জগৎ—

যাকে দেখিনি, যার কথা কখনও শুনিনি, কল্পনাতে যার ছবি আনতে পারিনি-- দেখব।

মসিয় তেরেই একটুক্ষণ থামলেন। একটু হেসে বললেন, "ঐ অত উঁচুর পাতলা বাতাবরণে কখনও কখনও এইসব অদ্ভুত ভাব মনে জাগে।

"ঘণ্টা দুয়েক অবিশ্রাম উঠলাম। উঠতে উঠতে হঠাৎ দেখি, দূরে এক বিরাট পাথরের প্রাচীর। সর্বনাশ! ক্রমে তার নিচে এসে থমকে দাঁড়ালাম। কিন্তু না, সর্বনাশের কিছু নেই। দেখলাম পাথরের গায়ে গায়ে অনেক খাঁজ। খাঁজের ভিতর বরফের লেশ নেই। মাঝে মাঝে ধাপও আছে।

"বরফের পাহাড় ছেড়ে এবার চলল পাথরের পাহাড়ে চড়ার পালা। ঘণ্টাখানেক এইভাবে শুধু পাহাড় বেয়েই উঠতে হ'ল। তারপর একেবারে আখেরি পাল্লায় এসে পড়লাম। চূড়ার নাগালের মধ্যে এসে পড়লাম যখন, তখন মনে বল এল। আজ হেস্তনেস্ত একটা না করে ছাড়ব না। এবারে আবার বরফ পাওয়া গেল। কাটো বরফ। শুধু বরফই নয়, পাথরও কাটতে হয়েছে। এবার বেশ কষ্ট হতে লাগল! কিন্তু হাল ছাড়িনি আমরা। দুজনেই পালা করে বরফ আর পাথর কাটতে কাটতে যখন চূড়ায় পৌঁছে গেলাম, বেলা তখন প্রায় ১১॥টা হবে।

"অপরিসর চূড়ায় দুজনে বসে রইলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক। এভারেস্ট দেখলাম। কিছু খেলাম। ফটো তুললাম। তারপর নেমে চললাম। সাফল্য শরীরে দুনো বল এনে দিল। আমরা নামতে নামতে একেবারে ৩নং ক্যাম্পে চলে এলাম। সেইদিনই। তারপর আর কি? পরদিন নেতা জাঁ ফ্রাঁকো নিজে গেলেন।

সবাইকেই বললেন, যাও, যে পার, ঘুরে এস মাকালুর চূড়া থেকে। যে কথা সেই কাজ। একে একে সবাই চড়ল চূড়ায়। এমনভাবে গোটা দল আর কখনও হিমালয়ের চূড়ায় ওঠে নি। সে হিসেবে আমরা রেকর্ড করলাম একটা। কি বলেন?"

॥ ৩ ॥

মসিয়ে তেরেই বললেন, "না, রেকর্ড একটা নয়, এবারকার মাকালু অভিযানে ২টো রেকর্ড হয়েছে। আরেকটা করেছেন আমাদের ডাক্তার। ডাঃ লাপ্রা। বেস ক্যাম্পে এক শেরপার এপেণ্ডিক্স্ পেকে ফেটে যায়। যন্ত্রণায় সে এই মরে তো সেই মরে। ডঃ লাপ্রা তক্ষুনি সেইখানেই তার অপারেশন করেন। বেচে গেল লোকটা। না ভাল ওষুধপত্র, না উপযুক্ত সরঞ্জাম, ডাঃ লাপ্রা বাচিয়ে দিলেন ওকে। সে এক অদ্ভুত গল্প। আপনি বরঞ্চ ঘটনাটা ডাক্তারের নিজের মুখ থেকেই শুনুন। সাংঘাতিক গল্প।"

"ডাঃ লাপ্রা? ডাঃ লাপ্রা?"

কোথায় ডাঃ লাপ্রা? এঘর ওঘর খুঁজে মসিয় তেরেই ফিরে এলেন। বললেন, "না মসিয়, খুবই দুঃখিত। ডাঃ লাপ্রা হোটেলে নেই। বেরিয়ে গেছেন।"

কি আপসোস!

পুরনো বই-এর দোকানে

নাঃ সে বাতিক আর নেই মশাই। বই বই করে বাওরা, তেমন লোক, কই আর তো দেখিনে। বিদ্যাসাগরকে দেখি নি, তিনি যখন দেহ রেখেছেন, এ দুনিয়ায় আসবার টিকিট কাউণ্টারে লাইন দেবার অবস্থাও আমার তখন হয় নি, তবে বাপদাদার মুখে তাঁর গল্প শুনেছি। তিনি ছিলেন বই পাগল। বই-এর দোকান, সে আমলে হেথায় কোথা মশাই ? বই তখন মিলত বটতলা চিৎপুরে, কি চীনেবাজারে। এখন যে দিব্যি এখানে, এই কলেজ ষ্ট্রীটে ঘুরছেন ফিরছেন আর দোকানে ঢুকে তল্লাস নিচ্ছেন, দেখি মশাই অমুক বইখান, তখন, সেই বিদ্যাসাগরী আমলে সেটি হ'ত না। এ পাড়ার চেহারাই এমন ছিল না। তখন, বই কিনতে চাও, তো চীনেবাজার যাও কি বটতলা যাও, হ্যাঁ যদি হিম্মত থাকে চৌরঙ্গীর সাহেবপাড়াও ঘুরে আসতে পার। বিদ্যাসাগর বই-এর জন্য টৈ টৈ করে সব পাড়া ঘুরতেন। উনি দোকানে ঢুকেছেন কি দোকানী তটস্থ। আজ্ঞে পেন্নাম হই, পণ্ডিত মশাই। কি, এনেছ নাকি নতুন কিছু ? আজ্ঞে মুখ্যু মানুষ ক বলতে কোঁ কোঁ করি, নতুন পুরাতনের কি বা বুঝি। পেছনে পড়ে আছে বাণ্ডিল, দয়া করে দেখে শুনে নিন। তো বিদ্যাসাগর বই ঘাঁটতে বসলেন। ধুলো ঝাড়তে বসলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ঘণ্টা দুই তিন বাদে গলদ্ঘর্ম হয়ে খান দু'য়েক বই নিজে নিলেন, বাদবাকী বইগুলি সাজিয়ে রেখে দোকানীকে বললেন,

বাপু ওগুলো একটু কষ্ট করে সাজিয়ে রেখ। তা তেমন নিষ্ঠা এখন কই ?

তবে বুঝলেন, ভদ্রলোক চায়ের গেলাসে একটি চুমুক মেরে বললেন, আমি স্যার আশুতোষকে দেখেছি। আমার পিতাকে খুব স্নেহ করতেন কিনা। হাইকোর্টের কাজ সেরে ইউনিভার্সিটি যাবার আগে রোজ একবার আমাদের দোকানে আসতেন। রেয়ার বই-এর কলেক্‌শন তখন আমাদের দোকানে, মানে আর ক্যামব্রের দোকানে, ভাল ছিল। স্যার আশুতোষের ভাব দেখে মনে হ'ত, আর ক্যামব্রের দোকানে না এলে তাঁর যেন ভাতই হজম হ'ত না। দোকানে ঢুকেই আতিপাঁতি খোঁজ, কোন্ ঘুপচির মধ্যে একখানা বই লুকিয়ে আছে, টেনে বের করলেন সেখানা। বগলে করে নিয়ে গেলেন। আবার এমনও হয়েছে, রোজই আসছেন, কোণাঘুঁজি খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে চলে যাচ্ছেন, অথচ যে বইখানা খুঁজছেন সেটা কিন্তু একেবারে তাঁর নাকের ডগায় সামনের তাকের মধ্যে বসে বসে 'খুঁজি খুঁজি নারির' মজা দেখছে। হয়ত মাস খানেক পর সেটার উপর স্যার আশুতোষের নজর পড়ল, আর তিনি 'আরে এই যে' বলে সেখানা বগলে পুরলেন। এঁরা সব বুঝলেন, মানুষই আলাদা, শুধু তো পড়ুয়া নন, বই-এর শিকারী। বন তাড়িয়ে বাঘ মারার আনন্দ এঁরা পেতেন দোকান ঝেঁটিয়ে একখানা দুষ্প্রাপ্য বই বের করাতে। আশুবাবুর পার্সোনাল কলেকশনটা একবার দেখেছেন ? যান না একদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। দেখে থ' হয়ে যাবেন। কত যে বই, আর কত রকম বিষয়ের, তার ইয়ত্তা নেই। আশুতোষের ছেলেরা দান করে দিলেন সেগুলো ন্যাশনাল লাইব্রেরীকে। ভালই হ'ল, জাতীয় সম্পত্তি হয়ে থাকল।

বই গুচ্চের কিনলেই হ'ল না মশাই, যত্ন করে টিকিয়ে রাখেন তবেই না। বই-এর শত্তুর তো কম নয়, বন্ধুরা আছেন ওঁৎ পেতে। বুঝলেন এই বন্ধুরাই হলেন হাত সাফাইয়ে ওস্তাদ। বই একখানা এঁদের হাতে পড়েছে কি আর ফিরল না। চোখ বুজে সেটাকে খরচের খাতায় জমা করতে পারেন। ঐ যে কথায় আছে, কলম, সাইকেল, বউ আর বই, একবার বেহাতে গেলে ফেরার ভরসা কম। তা একেবারে ঠিক কথা মশাই। তাই বলছিলাম, বন্ধু হইতে সাবধান। সেই বন্ধুর নেকনজর থেকে যদি বা বই বাঁচালেন তো নজর পড়ল চোরের, উইয়ের, ইঁদুরের, ধুলোর। রোদ বাতাস না লাগালে বই টেঁকে না। স্যার আশুতোষ সেবেক তার বই দেখভাল্ করবার জন্যই চাকর রেখেছিলেন অনেকগুলো।

স্যার গুরুদাস বাঁড়ুজ্জেরও পুরনো বই কেনবার অভ্যাস ছিল। আর অভ্যাস ছিল রাখালদাস বাঁড়ুজ্জের। রাখালবাবু অনেক বই বাবার কাছ থেকে কিনেছিলেন, ভদ্রলোক বললেন, আমাদের দোকান ছাড়া ভাল বই মানে তত্ত্বমূলক ভাল পুরনো বই, বিশেষ করে ভারত সম্পর্কে সর্বরকমের বই আর কোথাও মিলত না। রাখালদাসবাবুর শেষ জীবন তো খুব কষ্টে কেটেছে কিনা, তাই তাঁর বইগুলো নিজেই সব বিক্রী করতে বাধ্য হন। নিজে হাতে নিজের বই বিক্রী করা সে যে কি কষ্ট না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না।

ঠিক এইরকম কথা আরেকজন বই বিক্রেতার মুখে শুনেছিলাম। তিনি যার কথা বলেছিলেন, সে ভদ্রলোক পূর্ববঙ্গের এক বড়ঘরের ছেলে। বহু বই কিনেছিলেন। পড়াশুনোও ছিল ভাল। অবস্থা বিপাকে জমিদারী খুইয়ে কলকাতায় আসেন। বইগুলো সব

সঙ্গেই এনেছিলেন। তারপর অভাবের তাড়নায় বইগুলো একে একে বিক্রী করতে থাকেন। দোকানী বললেন, কি বলব মশাই, ভদ্রলোক কিছু কিছু বই বেচে যান, তারপর যদি না সে বইগুলো বিক্রী হয়, রোজ আসেন, সেগুলো নাড়াচাড়া করেন, চলে যান। যেদিন বইগুলো বিক্রী হয়ে যায়, সেদিন তাঁর কি অবস্থা! যেন পুত্রকন্যার বিয়োগ ঘটেছে এ নি আঘাত পান। কত রকম যে লোক আসে মশাই।

দুষ্প্রাপ্য পুরনো বইয়ের দোকান কলকাতায় খুব বেশী নেই। পুরনো বইয়ের দোকান যদিও সারা কলকাতায় অজস্র। শুধু যে কলেজ ষ্ট্রীট, ভবানীপুরেই, তা নয়, চৌরঙ্গী, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, পার্ক ষ্ট্রীটেও পুরানো বইয়ের দোকান ছড়িয়ে পড়েছে। এই অজস্র দোকানের মধ্যে সিরিয়াস মনের খোরাক জোগাতে পারে মাত্র দুটি কি একটি দোকান।

তাদেরই একজনের সঙ্গে সেদিন কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। ভদ্রলোক বললেন, ভাল ভাল বই আমরা আনাই বিলাত থেকে। সেখানে কয়েকজন ব্যবসায়ী আছেন, তাঁদের কারবারই এই, দেশ বিদেশ থেকে রেয়ার বই যোগাড় করা, তা আবার দেশ বিদেশে বিক্রী করা। সময় সময় ওরা ক্যাটিলগ পাঠায়, সেই তালিকা দেখে আমরা বই বাছাই করি। এই বাছাই করাই সবচেয়ে কঠিন। নাটক নবেল নয় মশাই, যে গাদা গুচ্চের এনে জড় করলুম, আর টপাটপ সব মাল কেটে গেল। পুরনো বই তো শ'য়ে শ'য়ে কপি পাবেন না, আর বই যদি একবার খদ্দেরের তাক ফস্কাল তো টাকা গজব। তাই প্রোফেসর পণ্ডিত লোকদের সঙ্গ ছাড়লে আমাদের চলে না। তাঁদের সঙ্গে উঠ-বোস করতে হয়। এইভাবেই তাঁদের

চাহিদাটা জানতে পারি। আর সেই অনুযায়ী মাল আনাই। ক্যাটলগ করা আর চিঠিপত্র লেখা, এ কারবারের দশ আনা দাঁড়িয়ে তারই উপর। রিসার্চ স্টুডেন্টরাই তো আমাদের খদ্দের। কিন্তু ভাবগতিক দেখে তো ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছি। সে সব ছাত্রদের হ'ল কি, বই শিকারে তারা আর আসছে না, আগের মত।

জিজ্ঞাসা করলাম, পুরনো বাঙলা বই, ভাল বই আছে, আপনার সন্ধানে। জবাব পেলাম, বাংলা বই! না মশাই, বাংলা বই রাখিনে আমরা। সে সব ঐ ফুটপাথের রেলিংয়ে খোঁজ করুনগে, ওদের কাছে পেতে পারেন।

এ এক সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার। কলকাতায় এত রকম জিনিস কেনাবেচা হয়—রকমারি নতুন-পুরনো বইয়ের দোকানও যথেষ্ট। কিন্তু মশাই মাথা খুঁড়লেও একশ দেড়শ বছর আগেকার কোনও বাংলা বই পাবেন না। একখানা প্রথম এডিশন মেঘনাদ-বধ কাব্য কি কথামালা, কি দুর্গেশ নন্দিনী বের করুন দিকি? বইতো পাওয়াই যাবে না,—সে কথা নয়, আমি বলছি, এমন একটা দোকানই কলকাতা শহরে পাওয়া যাবে না, যারা খেটেখুটে এই জাতীয় দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করে রাখে

ভদ্রলোক বললেন, আমাদের মশাই ইংরাজি বইয়ের কারবার। বাংলা বইয়ের কথা বলতে পারিনে। খোঁজখবর নিতেই বা কটা লোক আসে? বাংলা বই তো কেউ যত্ন করে রাখে না, যাঁরা রাখেন তাঁরা এমন গোপনে রাখেন কাকপক্ষী টের পায় না।

এমনি করে ভাল-ভাল কালেকশন সব গায়েব হয়ে গেছে। আরে মশাই, হরিনাথ দের বইগুলো যে কি করে লোপাট হয়ে গেল কোথায় গেল, সে এক রহস্য। কোন পাত্তাই করতে পারলাম না তার।

আর হ্যাঁ, অনেক বই হাতছাড়া হয়ে গেছে বাংলা ভাগ হয়ে গিয়ে। পূর্ববঙ্গে আমাদের খুব ভাল মার্কেট ছিল বইয়ের। বড় বড় সব জমিদার ছিলেন। নানা রকম নেশা ছিল তো তাঁদের। কারো কারো ছিল বইয়ের নেশা। রংপুর, পাবনা, ময়মসিংহ ফরিদপুব, যশোরে আমরা বহু বই পাঠিয়েছি। তবে একটা মজা ছিল ; ওঁরা বেশির ভাগ ধর্মতত্ত্ব, বৈষ্ণব সাহিত্য, শিকার সম্পর্কিত বই পছন্দ করতেন। ইতিহাস, দর্শন এসবও কেউ কেউ কিনতেন।

বইগুলো যে নষ্ট হচ্ছে তাই বা কে বললে ? আমার মুখ দিয়ে কথা বের হতে না হতেই ভদ্রলোক ফোঁস করে উঠলেন, কে বললে ! আমি বলছি। স্বচক্ষে দেখেছি তবে বলছি। ঝাল খেল বাগবাজারের পদা আর আমি এখানে লাল ফেললাম, তেমন লোক আমায় পাননি। তবে বলি শুনুন, এক ভদ্রলোক বছর খানেক আগে দোকানে এলেন। পূর্ববঙ্গেব এক জমিদারের নাম করে বললেন, উনি তাঁর ছেলে। চিনলাম। ওঁর বাবা অনেক বই কিনেছেন এককালে। বললেন, অনেক ঘুঁষঘাষ দিয়ে বাবার কিছু বই এনেছেন। সেগুলো বেচতে চান। গেলাম বই দেখতে। সাত আট বাক্স। খুললাম এক-এক করে। সারাদিন বই ঘাঁটলাম। কিন্তু বৃথা। উইয়ে কেটে সব মাটি বানিয়ে দিয়েছে। হাঁড়ির একটি দানা টিপলেই সব ভাতের খবর জানা যায়, মশাই।

ভারতের দুশমনী যেমন করেছে ইংরেজরা, যেমন চুটিয়ে শোষণ করেছে, শুনলে আশ্চর্য হবেন, ভারতের সভ্যতার ইতিহাসও আবার তারাই উদ্ধার করেছে। মোক্ষমূলর আমাদের দেগে দিলেন আর্য বলে। ব্যস্ তারপর টনক নড়ল দুনিয়ার সব বাঘা বাঘা পণ্ডিতদের। নাওয়া খাওয়া কমিয়ে দিয়ে কোমর বেঁধে খোঁজ খোঁজ রবে তাঁরা

বেরিয়ে পড়লেন। তার ফলে যেসব কেতাবের জন্ম হ'ল তার ইংরেজি সংস্করণের বেশির ভাগই, ঐ দেখুন তাক ভর্তি।

ভদ্রলোকের কথামত দেখলাম। তাকে তাকে ঘরখানা ঠাসা আর তার মধ্যে রাজ্যের বই বাসা বেঁধেছে। বিবর্ণ মলাট, রং-চটা জলুস ওঠা। ঘরে ঢুকতেই নাকে পরশ লাগে বিচিত্র এক গন্ধের। বহুদিন আগে এক বন্ধু বলেছিলেন, কেনো আর না কেনো, বই ঘেঁটে যেও এন্তার, গন্ধে গন্ধে যেটুকু জ্ঞান পাবে, তাও ফ্যালনা নয়।

তাই আমি বই ঘাঁটি। যে দোকানের কথা বললাম ও ছাড়া আর যে দোকান আছে পুরনো বইয়ের সেগুলোর কদর ছাত্রদের কাছে। টেক্‌স্‌ট্‌ বই ছাড়া আর কিছু রাখেন না এঁরা। প্রফিট যা কিছু সব তো কলেজ বইতে। তাক মত ঝাড়তে পারলে ছু' তিনশ পারসেন্ট ট্যাঁকে চলে আসে। তবে ঘরে বসে ল্যাজ নাড়লে চলবে না স্যার, মার্কেটের তাবৎ খবর আপনার জামার বুক পকেটে রাখতে হবে। আপনার তাকে যে সার্জারীর বইখানা আছে, কি অঙ্কের, কি অর্থনীতির, কি রসায়ন শাস্ত্রের বইখানা আছে খবর নিন বাজারে ও বই আছে কি না? নতুন বইয়ের দোকান কি বললে, নেই? বেশ তবে মওকা মিলেই গেল, নতুন বইয়ের যা দাম, তার উপরেও ছু' টাকা চড়িয়ে এবার গিয়ে ঘুম দিন। ও বইয়ের নেট প্রফিট দুগুণ এসে যাবে। গরজ বড় বালাই। কলেজ বইয়ের কারবারে দাঁও কষাকষি তো আকছার চলে। মোটা লাভ মেলে আইনের বইয়ে, ডাক্তারী বইয়ে, অনার্স আর এম-এ, এম-এস্‌-সির পাঠ্য বইগুলোতে।

আমার-আপনার মত লোক, বিদ্যের গভীর জলে বুড়বুড়ি কাটবার হিম্মৎ নেই যাদের, এসব দোকানে তাদের তেমন ফয়দা নেই।

তাঁরা মুখে বাতাস টানেন ফুটপাতে। ফুটপাতে বইয়ের জাতগোত্তর আলাদা। এখানে বাবা একেবারে কম্যুনিষ্টির ব্যাপার। বইকুলের যারা প্রোলেতারিয়া তারাই হেথা রাজ্য করে। গাদার মধ্যে কি আছে আর না আছে কেউ জানে না। যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার পরশ রতন।

ফুটপাতের বই খুঁজতে সুখ। পথের গাদায়, কি রেলিংয়ের সারে, কি ছোট ছোট বাক্সে, কি আছে তার পরিচয় নেই, ক্যাটালগ নেই। যেতে যেতে থমকে দাঁড়ান, হাতড়াতে থাকুন এটা-ওটা। আরে, রামেন্দ্র সুন্দর গ্রন্থাবলী ? ওহে কত দাম ? দেড় টাকা ? দেড় টাকা ! কত হ'লে দেবে বল তো ? ঠিক দাম বলব, পাঁচ সিকিতে দিতে পারি। টানা হেঁচড়া শুরু হ'ল। এপক্ষ নামছে দেড় টাকা থেকে ও পক্ষ উঠছে বার আনা থেকে। এক টাকা দু আনায় রফা হ'ল। ও পক্ষ খুশি, সস্তায় ভাল একখানা বই-ই মিলেছে। এ পক্ষ খুশি চার আনা সের দরে পরশু যে লটটা কেনা হ'ল, তার বউনি ভালই বলতে হবে। মাঠাকরুণ লোক ভাল। ও বাসায় আবার যেতে হবে। ঘাই মেরে দেখতে হবে, মোটা কিছু মেলে কি না।

কংগ্রেস নগর থেকে কলকাতায় আসবার ট্রেনটা, কথা ছিল ছটা দশে ছাড়বে, কিন্তু কি কারণে জানিনে লেট্ করল। তা প্রায় মিনিট চল্লিশ। নতুন রং করা গাড়ীখানা দাঁড়িয়েছিল। প্রায় গোটা পাঁচেকের সময় এসে একখানা ফাঁকা কামরা দখল করে বসেছিলুম। কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যেই তা এমন ভরে গেল যে তিল একটা ঢুকবে তার জায়গা নেই। ট্রেন একে অসম্ভব রকমে ভর্তি, তায় বেশ লেট, কাজেই যাত্রীরা অধৈর্য হয়ে পড়েছেন।

অনেকে সেই সকালের দিকে এসেছেন কল্যাণীতে, যেখানে 'নয়া কলকাতা' গড়ে উঠছে। শ্রমিক যারা, ভাষার পুঁজি যাদের সীমাবদ্ধ, তারা বলে 'নয়া কলকাত্তা'। তাদের চোখে কলকাতার বাড়া আর কিছু নেই। এমন অনেকের সঙ্গেই পথে, প্রদর্শনীতে রেল টিকিটের কাউণ্টারে, বাসের ভিড়ে সারাদিনই দেখা হয়েছে। পথ চলতে তাদের বলা-কথার অনেক টুকরো কানে গেছে। সকলের মনেই এই এক প্রশ্ন জেগেছে কি না জানিনে, তবে অনেকের হতভম্ব মুখ থেকে শুনেছি, এখানে হবে কি ? 'কা জানে কেয়া হোগা। শুনা, কি টিরাম, সিন্‌মা, আসপাতাল, ইস্‌কুল, সব হোগা। দুস্‌রা কলকাত্তা বনেগা। আরে বাপ, বহোৎ ভারী টাংকি বানায়া।' শুধু কি ট্যাংক দুটোই ? অবাক হবার আরও জিনিস আছে। গাঁটের সঙ্গে ছড়া বেঁধে বেঁধে একদল গ্রাম্য বধূ সচকিত হয়ে এগুচ্ছিল, তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। কল্যাণীর বুকে

আলো জ্বলে উঠেছে, অজস্র বিজলীর আলো। আলোর সারির আর অন্ত নেই, তার আর গুণতি নেই। কটা গাছেও আলোর ঝাড় বসেছে। গ্রামবধূর দলটি মুগ্ধ, অবাক। দলটির মধ্য থেকে কে একজন বললে, 'হায় গো সেজ খুড়ি, দ্যাখ, দ্যাখ, কি আলো কি আলো।'

চার ঘণ্টা ধরে হেঁটেছি কংগ্রেস নগরের একোণা আর ওকোণা। আর এই কিছু প্রথম আসাও নয় আমার। আমার শহুরে চোখে আলোর হাতছানি খুব একটা মায়া লাগায় না। ট্যাংক দেখে অবাক যারা হয়, তাদের প্রতি মন আমার করুণাই ঢালে। কিন্তু ওদের বিস্ময় বড় অকৃত্রিম। মাটির সঙ্গে ওদের যোগ নিবিড়। হঠাৎ আমার মনে পড়ল, কল্যাণীর এই সমারোহ, সত্যিই কত বড় তার পরিমাপ ওদের পক্ষেই করা সম্ভব।

কল্যাণীর এই উদ্যোগ আয়োজনে কে কত টাকা পকেটস্থ করেছেন, শ্রীরামপুরের দুটি ছোকরা ওপাশের বাঙ্কে বসে তার ফিরিস্তি দিচ্ছিল। হঠাৎ তার একজন বললে, "কিন্তু যাই বল, নিজের চোখে কিছু না দেখলে তার আইডিয়া করা যায় না। এত যে কাণ্ড এখানে হয়েছে, কল্যাণী যে এতবড়, শ্রীরামপুর থেকে তার আভাসও পাইনি। বেড়ে করেছে, কি বলিস।"

যে কল্যাণীর চেহারা সারাদিন ধরে দেখলুম, সেখান থেকে ভবিষ্যতের কল্যাণীতে পৌঁছতে হলে নিঃসন্দেহে আরো অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। কিন্তু অনেক চড়াইউৎরাই যে ইতিমধ্যেই কল্যাণীকে পার হতে হয়েছে তা কে অস্বীকার করবে? কল্যাণী এখন কদিন ধরে সংবাদের মানচিত্রের একটি প্রধান স্থানে থাকবে। সারা ভারতের সংবাদপত্র আর সংবাদ সরবরাহক প্রতিষ্ঠানসমূহের

প্রতিনিধিরা এসে জড় হবেন, পর পর কদিন ধরে শুধু টেলিগ্রাম যাবে 'কংগ্রেসনগর, কল্যাণী হইতে' তারিখ অমুক আর তারিখ তমুকের সব খবর যাবে স্থানান্তরে।

কিন্তু কদিন আগে, কমাস আগে, বছরখানেক আগে কি ছিল কল্যাণী? এক বিস্তীর্ণ মাঠ। কে চিনত তাকে? সরকারী আফিসের কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী, কয়েকজন সিভিল ইঞ্জিনীয়ার, যাঁদের মনে এই নগরীর পরিকল্পনা বাসা বেঁধেছিল, তাঁরা ছাড়া আর কে তার খবর জানত? আর জানত জমির দালালরা। গতবছর যখন রাষ্ট্রপতি কলকাতায় এসেছিলেন, তখন কল্যাণীর নির্মাণকার্য কিছুটা এগিয়েছে। জমি সমান করা হচ্ছে, জঙ্গল কাটা হয়ে গেছে, রাস্তা তৈরী হচ্ছে। রাষ্ট্রপতিকে ফাঁকা ময়দানে ঘোরান হ'ল, রাস্তার মোড়ে মোড়ে রাখা নীল চার্ট আর নক্সা দেখিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল। এটা হবে, ওটা হবে—রাষ্ট্রপতি শুনলেন। শুনলেন, আণ্ডার ড্রেন হয়ে গেছে। কিন্তু তাতো চট করে চোখের দেখায় মালুম হয় না। আর কি হয়েছে, চোখে দেখে খুশী হওয়া যায় এমন কি তৈরী হয়েছে? কেন জলের ট্যাঙ্ক। ওই দেখুন না বিরাট দুটো ট্যাঙ্ক। এই শহরে আর যারই হোক জলের অভাব হবে না। রাষ্ট্রপতি নাকি তাতেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

তখনও কল্যাণী নির্জন। তখনও কল্যাণী ইঞ্জিনীয়ারদের নীল নক্সায় বন্দিনী। সেদিনকার কল্যাণীকে যাঁরা দেখেছেন, আজকের এই শত শত কুটীর, ছাউনি, অজস্র দোকান পসরা, বিরাট মণ্ডপ প্রদর্শনীর স্টলসমূহশোভিত, অজস্র আলোকে উজ্জ্বল, অগণন পদশব্দে কম্পিত মানুষের আবালবৃদ্ধবনিতার কলস্বরে মুখরিত কল্যাণীকে দেখে বিস্মিত হবেন।

তবুও সব কাজ সম্পন্ন হয়নি, না কল্যাণীর না কংগ্রেসনগরের। যত পাকা বাড়ী ওঠাবার পরিকল্পনা ছিল, তার চেয়ে ঢের কম উঠেছে। যেদিন প্রদর্শনী উদ্বোধন করা হ'ল সেদিনও সব ফাঁকা পূর্ণ হয়নি। প্রদর্শনীর স্টলগুলি সাজাতে ব্যস্ত কর্মকর্ত্তাদের একজনকে ধরে কারণটা জিজ্ঞেস করতেই তিনি খিঁচিয়ে উঠলেন, "সেকথা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন, কর্তাদের জিজ্ঞেস করুন। টাকা পয়সা জমা দিয়েও চোর হয়ে আছি। এ বলে ওর কাছে যান, ও বলে তার কাছে যান। কলকাতার অফিসে টাকা জমা দিয়ে রসিদ নিলুম। রসিদে স্টলের নম্বর লেখা স্পষ্ট করে। সেখান থেকে বলে দিলে এবার কল্যাণী চলে যান, সেখানে লোক আছে স্টল দেখিয়ে দেবে। এলাম কল্যাণী। ও মশাই, কোথায় স্টল আর কোথায় কি? ইঞ্জিনীয়ারবাবু রসিদটি বেশ করে দেখলেন তারপর নক্সা বিছিয়ে বলে দিলেন, না এ স্টল তো আপনার নয়। আমাদের প্ল্যান বদলে গেছে। ওখানে আর স্টল তৈরী করাই হবে না। বুঝুন, চোখে তো অন্ধকার দেখলুম। তাহলে উপায়? আর কি, কলকাতায় ফিরে যান, বলুন গিয়ে ওঁদের। বুঝলেন, তারপর সমানে কলকাতা আর কল্যাণী ঘোড়দৌড় করিয়ে ছেড়েছে। তা কখনই বা স্টল বানাব আর কখনই বা তা সাজাবার কথা ভাবব।" আরেকজন বললেন, "জিনিসপত্র বিক্রী তো বড় বিশেষ ওখানে হবার সম্ভাবনা নেই, তাই আর গা করিনি। তবে হ্যাঁ, পুরনো ফার্ম আমাদের, উপস্থিত হতে হবে বৈ কি, তাই আসা।"

অনেকের আবার উৎসাহের শেষ নাই। চার রাত চার দিন সমানে কাজ করছেন। গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। তবু ঠিকমত শেষ টাচ্‌টা দিতে পারছেন না। ফিনিশটা ঠিকমত মনঃপুত হচ্ছে

না। "আহা হা, ওটা ওকোণে রেখ না হে, আন আন আরো এগিয়ে আনো। আর একটু আর একটু হ্যাঁ, এই হয়েছে। বেশ হয়েছে। বাঃ!" "ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন আর খুশী মনে হাসেন। "এইবার ত্মাখ দিকিনি, কেমন খোলতাই হ'ল। দেশ বিদেশ থেকে লোক আসবে। অল ইণ্ডিয়া এক্‌জিবিশন এটা, খেলা কথা নয়। বাইরে থেকেও লোক আসবে। সবার চোখে উজ্জ্বল হয়ে থাকা চাই। দেশের ইণ্ডাষ্ট্রীর পরিচয়টা চট করে চোখে তুলে ধরতে হবে। নাও, নাও, ওপাশের কাজটুকু শেষ করে ফ্যালো। ফূর্তি করো ভাই, সময়ং মোটে নাস্তি।"

কি ভয়ানক তাড়া কাজের। যত কংগ্রেসের অধিবেশন এগিয়ে এসেছে, তত কাজের তাড়া লেগেছে। আগের দিকে গা ঢালা দেওয়ার ফল। শান্তিনিকেতনের কলাভবনের এক অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা। গুটিকয় ছাত্রের সঙ্গে বিরাট এক মই ঘাড়ে করে একটা তোরণের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তোরণগুলো সেদিন (১৬ই জানুয়ারী) সব তৈরী হয়ে ওঠেনি। ম্লান হাসলেন অধ্যাপকটি। বললেন, "কি আর বলব দেখছেন তো কাণ্ড। প্রায় দুমাস ধরে পড়ে আছি। ছবি-টবি কবে আঁকা হয়ে গেছে। কবে থেকে তাগাদা দিচ্ছি মশাই। সবাই ১৬ তারিখ ধরে বসে আছে। তা গেটের কনট্রাক্টর, সেও ১৬ তারিখে কাজ শেষ করবে, যে কোম্পানী বাঁশের চাটাই দিয়ে গেট ছাইবে, সেও ১৬ তারিখে গেট ছাইবে, আর সকলের শেষে আমরা তো আছিই। এই দেখুন না, একশ ফুট গেট, এই নড়বড়ে মইটা লাগিয়ে তার উপর চড়ে ছবি লাগাতে হবে। না একটা সাহায্যকারী আছে, না পাচ্ছি একটা মজুর। যা মজুর আছে এখানে এখন, এই শেষের দিকে তাদের চাহিদা অসম্ভব বেড়ে গেছে।

এ যদি বলে পাঁচটাকা দেব, সে বলছে, কাম অন্ হাম্ দেগা সাঢ়ে পান্চ্। মজুরের জন্যে অপেক্ষা করলে আর ছবি টাঙান হয় না, তাই নিজেরাই বেরিয়ে পড়েছি। নাও মইটা ভাল করে লাগিয়ে সাবধানে উঠে পড় হে। সময় নষ্ট করে লাভ নেই।"

শান্তিনিকেতনের কলাভবন থেকে এবারে প্রায় গোটা তিরিশেক ছাত্র ছাত্রী এসেছেন। এদের উপর কংগ্রেসনগর সাজাবার ভার পড়েছে। তোরণগুলো আর মঞ্চগুলো ছবি দিয়েই সাজানো হবে। তা তিন শ'র উপর ছবি এঁদের আঁকতে হয়েছে। এমনি মাটি, এলা মাটি আর ছাই—এই হল এঁদের ছবি আর আলপনা আঁকবার প্রধান রঙ। ছবির বিষয়বস্তুও সাদাসিধে। জীবনের কর্মের দিক, ধর্মের দিক—বিভিন্ন দিকই নানা ছবির মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। মঞ্চসজ্জার দিকেই এঁদের বেশী দৃষ্টি দিতে হয়েছে, তোরণগুলোতে মাঝে মাঝে ছবি ঝুলিয়ে একটা সৌন্দর্য ফোটাবার চেষ্টা করা হবে। ওঁদের একজন বললেন, "বারটা তোরণ, সবগুলো ছবিতে ভরিয়ে দেওয়া কি সম্ভব? তাহলে তো হাজার ছবি আঁকতে হয়।"

কল্যাণীতে কংগ্রেসনগরের জন্য যে বাসস্থান তৈরী করা হয়েছে, তার প্রায় সবগুলোই অস্থায়ী। হয় টিন, নয় 'টারফেল্ট'—ত্রিপল ধরণের একটা জিনিস দিয়ে তৈরী। তবে স্থায়ী বাড়ি, পাকা বাড়িও কিছু উঠেছে বটে। ১৫ বেডের একটা হাসপাতালের উদ্বোধন করলেন ডাঃ রায়, ১৬ তারিখে। শুনলাম বাজার আর ইস্কুলও নাকি হয়েছে। আর গড়ে উঠেছে একটা সুন্দর কৃষিক্ষেত্র। ওটা সরকারী। ২৫০ একর জমিতে ওঁরা আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ শুরু করেছেন। ম্যানেজারবাবু বললেন, "এইত প্রথম চাষ, তাও খুব তাড়াহুড়ো করে করতে হয়েছে। আমাদের যন্ত্রপাতিও বেশি ছিল না, যেসব

বুলডোজার ট্রাকটার কল্যাণী নগরের মাটি সমান করার জন্য আনা হয়েছিল, তারই কিছুকে ধরে পাকড়ে এনে কাজ করিয়ে নিয়েছি। কি জমি যে গোড়াতে ছিল, এখন ওই ক্ষেতটা না দেখলে বুঝতে পারবেন না, আসুন দেখাই। "ভদ্রলোক কৃষিক্ষেত্রের এক সীমান্তে নিয়ে গেলেন। বললেন, "দেখুন" দেখলাম, বাঙলা দেশের পরিচিত পতিত জমির চেহারা। উঁচু-নীচু অসমান, আগাছার জঙ্গলে ভর্তি আর অস্বাস্থ্যকর। ভদ্রলোক বললেন, "অবিকল ওই চেহারা ছিল, এই জমিরও।"

শুধু কি এই জমি, সমগ্র কল্যাণীরই এই চেহারা ছিল। এমনই অসমান, এমনই অস্বাস্থ্যকর, আগাছাময়, শৃগালাদির অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। ইতিহাস বলে, কাঞ্চনপল্লীর সংলগ্ন ছিল এই স্থান। তখন সমৃদ্ধ এক জনপদ ছিল হয়ত। কিন্তু কালপ্রবাহে সেদিনের বাস্তব লুপ্ত হয়েছে। আজ তা ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জনশূন্য প্রান্তর মানুষের পদধ্বনি শুনবে বলে হয়ত বহুদিন ধরে প্রতীক্ষা করে ছিল। যুদ্ধের মধ্যে মার্কিন সৈন্যরা কি করে যেন এসে উপস্থিত হল, ছাউনি গাড়ল, বিমানক্ষেত্র তৈরী করল। রাস্তাঘাট কংক্রিট করে নির্জন স্থানটি দিনরাত সচকিত করে তুলল। সেই সব রাস্তার কয়েকটাকে কল্যাণী এবার নিজের কাজে লাগাতে পারবে। পথ সভ্যতা বিস্তা-রের, বাণিজ্য বিস্তারের প্রধান সহায়।

"ভাল পথ নেই বলেই তো মশায় সব্জী-টব্জী ওপারে নিয়ে যেতে পারছিনে। যদি গাড়ী করে ওপারে নিয়ে ফেলতে পারতাম তো ভাল মার্কেট পাওয়া যেত।" কৃষিক্ষেত্রের ওভারসিয়ারটি বললেন, "তবু এবার প্রথমবার. আরেক চাষ পড়বার পর দেখবেন, এ-মাঠে সোনা ফলবে। ট্রাকটারের চাষে উপরের মাটি অনেক নীচে চলে

যায় কি না, সেটা ফিরে চাষে উল্টে আসবে। তবু তো ছাড়িনি কিছুই। ধান অব্দি লাগিয়েছিলাম। কিছু কিছু সব ফসলই পেয়েছি। আলুটা এবার ভাল হল না। মাটি আরো সমান চাই। মূলোটা প্রচুর হয়েছে মশাই, কিন্তু বাজারে দাম নেই। আর কপিক্ষেত তো সামনেই দেখতে পাচ্ছেন।"

সার সার ফলে রয়েছে। বাঁধাকপি, ফুলকপি আর ওলকপি। ওভারসিয়ারটি বললেন, "কংগ্রেসের সময় পঞ্চাশ হাজার করে ফুল ওল আর বাঁধাকপি সাপ্লাই দিতে হবে। বায়না আছে। প্রথম বছরের পক্ষে সব দিক বিবেচনা করে দেখলে ফলন খুব একটা খারাপ হয়নি কি বলেন?" "কিন্তু চাষের খর্চাটা পড়ল কেমন?" জিজ্ঞাসা করলাম। সরকারী চাষের ব্যাপার তো জানি। ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি, হবে না তো মশাই।" মশাই কথাটি কইলেন না। শুধু মোলায়েম একখানা হাসি ফুটিয়ে তুললেন মুখে।

ট্রেন আর ছাড়ে না। ছটা দশে ছাড়বার কথা। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপনও বেরিয়েছে তাই। আর ছটা কুড়ি যখন বাজে, তখনো ট্রেনের কোনও চাঞ্চল্য নেই। কামরার বাইরে লোক যত উঠছে, ঝুলে আছে ফুটবোর্ডে, ভেতরের চাপ তত বাড়ছে। বাঙ্কের ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠল, "কি দাদা, তত্ত্ব-টত্ত্ব নিন না. ছাড়বে কি ছাড়বে না। সেই কোন্ সকালে খেয়ে বেরিয়েছি, পেট একেবারে বয়লার হয়ে আছে।" একজন নীচের থেকে জবাব দিলেন, "তা জল, কয়লা ভরে নিলেই পারতেন, এখানে তো অভাব নেই কিছুর।" বাঙ্কের ছোকরা জবাব দিলে, "নমোসকার মোসাই, পুরো শিক্‌খে হয়ে গ্যাচে। উঃ কি জোচ্চর মোসাই, দুটি চপ খেলুম, সাইজটা বুঝলেন, জাস্ট আধখানা মুরগীর ডিম, দাম বললে চার আনা, আচ্ছা বাবা, দাও দুটো, দিলে,

একটি শেষ করে অন্যটির আধখানা দাঁতে কেটেছি কি আরেকজন ছুটে এসে প্রথম লোকটিকে ধমকালে, করিচিস কি, এতো আট আনার সাইজ, চার আনার সাইজ তো সব ফুরিয়ে গ্যাচে,—শুনেই তো মোসাই সে-চপ দাঁতেই আটকে রইল, গলা দিয়ে নামতেই চায় না, সেরেফ গলাটি পুঁচিয়ে ছেড়ে দিলে। কয়লার তো মোসাই, এই অবস্থা, তাই জলে আর ভরসা পেলুম না। বলে, এখানে চা আর খাচ্চিনি বাবা, চপের পয়সা চায়ে বাঁচাব।"

বাঙ্ক থামলেন তো ফুটবোর্ড শুরু করলেন, "থ্রোট কাটিং-এ কেউ কমা যায় না দাদা। গভমেণ্ট যে গভমেণ্ট, সে কি কাণ্ড করেছে দেখুন। এসপ্লানেড থেকে কল্যাণী বাস চালাচ্ছে, ষ্টেট বাস, ভাড়া করেছে আড়াই টাকা, কোন মানে হয়, তাও বুঝতুম যদি বসবার বন্দোবস্ত করত, গোণা-গুণতি লোক নিত, সেসব কিছু নয়, সেই গুড়ের নাগরীব মত ঠাস বোঝাই লোক নিচ্ছে। অথচ এমনি প্রাইভেট বাসে যান, পাঁচ সিকেও লাগবে না।"

সামনের বেঞ্চে এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন, বয়স প্রায় চল্লিশ হয়েছে, জিজ্ঞেস করলেন, "নেহেরু কবে আসছেন জানেন?" বললুম, "১৯শে। ২০শে তারিখ থেকে তো কংগ্রেসই শুরু হচ্ছে।" "কখন আসবেন জানেন কিছু?" বললুম, "চারটে সাড়ে চারটে নাগাদ পৌছুবেন বোধ হয়।" ওপাশ থেকে একজন বললেন, "সেই রকমই লিখেছে বটে কাগচে। কাঁচরাপাড়ায় নাববেন প্লেন থেকে, তারপর খোলা গাড়িতে কল্যাণী। প্রোসেশন-ট্রোসেশন নিশ্চয়ই হবে।"

সামনের ভদ্রলোকটি বললেন, "কি আশ্চর্য যোগাযোগ দেখুন, পঁচিশ বছর পরে বাঙলায় আবার কংগ্রেস বসছে। সেবারে সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, এবারে তাঁর ছেলে শ্রীজওহরলাল।

তখন জওহরলাল সবে বিলাত থেকে এসেছেন। উৎসাহ-উদ্যমে একেবারে তাজা ঘোড়ার মত টগবগ টগবগ করছে। সেইবার কংগ্রেসেই সবাই বলতে লাগলো, বাপকা বেটা। তা বাপকা বেটাই বটে। সেদিনও ওঁর চলনে বলনে যে ফূর্তি দেখেছিলুম, আজও তাই দেখছি, একটুও ভাঁটা পড়েনি। সেই ১৯২৮-এর কংগ্রেস আমি দেখেছি।" বাঙ্কের ছেলেটি বললে, "আহা-হা, আমরা তখন কোথায়?" ভদ্রলোক খুব রসিক। বললেন, "তোমরা তখন জন্মাও নি চাঁদ। তোমার দাদাবা বোধ হয় কোমরে ঘুন্সী বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। সে কি আর আজকের কথা রে ভাই। থাকতুম. ফরিদপুরে। খবরের কাগজে দেখতুম, কংগ্রেস হবে, কংগ্রেস হবে কলকাতায়। ভাবতুম, কি না জানি কাণ্ড। হঠাৎ একদিন দেখলুম, সুভাষবাবু আবেদন করেছেন, ভলান্টিয়ার চাই। মনে মনে বড় আশা, ভলান্টিয়ার হতে হবে। তখনকার কংগ্রেস, সে অন্য ব্যাপার। কাকা সরকারী উকীল। ওসব কংগ্রেস-ফংগ্রেস তখন আমাদের কাছে গোমাংস। আবার নবেম্বরে ক্লাসের পরীক্ষা। কি করে কলকাতা যাই। কলকাতা তখন ভাল চিনিও নে বছর চোদ্দ বয়েস তখন। তা পরীক্ষা-টরীক্ষা না দিয়েই চলে এলাম পালিয়ে। চেনাশোনা এক লোকের মেসে উঠলাম। আর তারপর ভলান্টিয়ার হবার জন্য ঘোরাঘুরি শুরু করলাম। ভর্তি হবার অফিসটি ছিল আমহার্স্ট স্ট্রীটে।" ভদ্রলোক একটু চুপ করলেন। তারপর বললেন "সে এক দিন গেছে। কে মন্ত্রী হবে, কে উপমন্ত্রী হবে, তার জন্য চিন্তা করবার, দল পাকাবার চিন্তা কংগ্রেসের মধ্যে তখন এত তীব্রভাবে দেখা দেয়নি। তখনও দলাদলি ছিল, তা অন্য কারণে। চরম আর নরমপন্থীদের দল

ছিল তখন, পরে হয় বামপন্থী দক্ষিণপন্থী। তখন কংগ্রেস যে কি সরগরম থাকত, যারা দেখেনি, বুঝতে পারবে না। কলকাতা কংগ্রেসেই তুমুল তর্ক উঠল সেবারে। কি চাই আমরা, কি আমরা দাবী করব, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন না পূর্ণ স্বরাজ? ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস না ইণ্ডিপেণ্ডেন্স? বাঙলার প্রাণে আর দেরি সয় না। বাঙলার তখন কেমন উন্মাদনা, বলি। কংগ্রেস সভাপতি যে যে পথে হাওড়া স্টেশন থেকে কংগ্রেস নগরে আসবেন, সেসব পথের দুধারে অজস্র পোস্টার সাঁটা হয়েছিল। বড় বড় গেটের উপরও অনেক কথা লেখা ছিল। সে সবই তখনকার বাঙলার মনের কথা, প্রাণের প্রার্থনা। একটার কথা এখনও মনে আছে, হে যুবক, দেশের বেদনা কি তুমি সত্য সত্যই উপলব্ধি কর? এই বেদনায় কি তোমার ক্ষুধা নষ্ট হইয়া গিয়াছে? তোমার নিদ্রা দূর হইয়াছে, তোমার স্বপ্ন দুর্ভাবনায় পূর্ণ হইয়াছে? —বুঝলেন, জনে জনের কাছে এই ছিল তখন বাঙলার জিজ্ঞাসা। আর স্বাধীনতা চাই, স্বাধীনতা চাই, স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার এই ছিল বাঙ্গালীদের ধ্বনি। সেই ১৯২৮ সালে খুব বেশি লোক এই ধ্বনি তুলতেন না।”

“সেসব যেন স্বপ্নের মত,” আমার এক আত্মীয়া সেদিন বলছিলেন, “মনে হয় যেন সেদিনের কথা। ভলান্টিয়ার হয়েছিলাম। কলেজে পড়তাম, থাকতাম হোস্টেলে। লোকাল গার্জেন ছিলেন দাদামণি। দাদামণি তো কিছুতেই রাজী হবেন না। শেষে বাবাকে লিখে মত আনাই। সকালসন্ধ্যা কি কুচকাওয়াজটাই না করেছি। যেদিন কলকাতার পথে আমাদের প্রোসেশন বের হল, সে কি হৈ-হৈ। আমরা লেফ্‌ট-রাইট করতে করতে ঘুরে

এলাম। কংগ্রেস নগরে একদিন রিহার্সাল হল আমাদের। বাবা তখন কলকাতায়। নিয়ে গেলাম রিহার্সাল দেখাতে। রোদে পুড়ে পুড়ে কিম্ভূত সব চেহারা হয়েছিল। বাবা বললেন, সবাইকেই তো অক্রূর মত দেখি। বোঝ ব্যাপারটা। মনে আছে, একদিন সাবজেক্‌টস কমিটিতে ডিউটি পড়েছিল আমার। জীবন তো সার্থক। সব মনে নেই, সবাইকে মনে নেই, গান্ধীজীকে মনে আছে, নেহরু পরিবারকে মনে আছে। কি একটা পরিবার! স্বরূপরাণী ছিলেন, কমলা নেহরু ছিলেন, বিজয়লক্ষ্মীও ছিলেন, বোধ হয় সভা যেন আলো হয়ে গিয়েছিল ওদের রূপে। আর একজনকে খুব মনে পড়ে, কে জানি নে, পাতলা ফর্সা রং, তাকে মনে আছে, কেন না সেদিন তিনি বারে বারে উঠে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। হ্যাঁ, আরেকটা ঘটনা মনে আছে, শোন। কংগ্রেস শেষ হলে, সুভাষবাবু, কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে ভলেন্টিয়ারদের সবাইকে খাইয়েছিলেন। খাওয়া দাওয়া তো চুকল। আর অমনি একটা মেয়ে, কি মনে হল তার কে জানে, সুভাষবাবুকে টপ করে এক প্রণাম করলে। আর যাবে কোথায়, একজন যদি করলে, অমনি এক এক করে সবাই। সুভাষবাবু প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর লাজুক লাজুকভাবে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর সে চেহারাটাও বেশ মনে আছে।"

ভদ্রলোকের কথায় তাঁর সেদিনের কথাগুলো মনে পড়ল। ভদ্রলোক বললেন, "অত কষ্ট করে কলকাতায় এলাম বটে, কিন্তু ভলেন্টিয়ার আর শেষ পর্যন্ত হতে পারলাম না। সে বড় কড়াকড়ি নিয়ম ছিল। ডাক্তার 'আন্‌ফিট্' বলে দিলে। সে যে কি দুঃখ, কি মর্মপীড়ন, কি বলব দু তিনদিন কিছু খেতেই পারিনি। ঐ কংগ্রেসেই পর পর তিনটে শক্ পাই। একে তো ভলেন্টিয়ার

হতে পারলাম না, তার উপর আরো একটা যে শক্ পেলাম সেটা আরো মারাত্মক। কংগ্রেসের সঙ্গে যে প্রদর্শনী হয়েছিল, তাতে অনেকরকম খেলাধুলোর ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। একদিন কুস্তি হবে, গোবর আর গামার। খবর ছুটল শহরের এ মাথা ও মাথা, কি ভিড় কি ভিড়। বাঙালীরা গোবর গোবর করে অস্থির। আর অবাঙালীরা গামা গামা বলে অজ্ঞান। টিন টিন ঘি ভেট দিয়েছে গামাকে। আমাদের সবার ধারণা ছিল গোবরের তুল্য বীর আর হয় না। কিন্তু ওমা, খেলা শুরু হতে না হতেই গামার এক প্যাঁচে গোবর চিতপটাং, একেবারে ঘুঁটে হয়ে গেল মশাই। ওঃ সে কী লজ্জা, কী অপমান, কেউ আর মুখ তুলতে পারিনে। পব পর দুটো শক্ খেয়েও টিঁকে ছিলুম, কিন্তু সুভাষবাবুব পূর্ণ স্বাধীনতাব প্রস্তাব ভোটে হেরে গেল যখন তখন আব পারলুম না, শোকে দুঃখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলুম।”

ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন। কি জানি, বোধ হয় পুবেনা কথাই ভাবছিলেন। তারপর এক সময় বললেন, “সে থ্রিল আব কখনো কংগ্রেসে হবে না। কংগ্রেস গতানুগতিক হয়ে পড়েছে। না হয়ে তো উপায়ও নেই কি না। তখন ছিল সংগ্রাম, এখন লক্ষ্য হচ্ছে শাসন। গোটা জিনিসটারই রূপ পালটে গেছে। বিধান বাবুর বক্তৃতা শুনলেন নাকি ?”

শুনেছিলুম। প্রদর্শনীব উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ডাক্তাব রায় এক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা বাঙলা দেশই প্রথম চালু করে। ভদ্রলোক বললেন, “পঁচিশ বছর আগেকার প্রদর্শনীটা দেখেও অবাক হয়েছিলেন সকলে। এবারও হবেন। তবে তখন ছিল খাদির খাতির। কুটির শিল্প আর খাদি,

এই ছিল তখনকার প্রদর্শনীর প্রধান জিনিস। যন্ত্রকে কংগ্রেস তখন স্বীকার করত না। দেশী মিলের কাপড় প্রদর্শনীতে রাখা হবে কি না, এই নিয়ে তুমুল বিতর্ক উঠল। শেষ পর্য্যন্ত খাদিরই জয় হ'ল। এতদিন পরে যন্ত্র খাদির উপর এক হাত নিলে। এই কল্যাণী কংগ্রেসেই কিন্তু প্রথম কংগ্রেসের সঙ্গে যন্ত্রশিল্পের প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হ'ল, সেটা মনে রাখবেন। ডাক্তার রায়ের কথাই ভাবছি। কেমন অনায়াসে বলে গেলেন, খাদি অখাদি নিয়ে তর্ক উঠতেই পারে না। দেশকে উন্নত করার জন্য যা কিছুর প্রয়োজন সব কিছুকে কাজে লাগাতে হবে। বললাম না, রূপ পালটে গেছে।"

এবার প্রদর্শনীতে দুই-এরই সমাবেশ হয়েছে। যন্ত্র শিল্প আর কুটির শিল্প দুই-ই আছে। তবু প্রদর্শনীটি দেখে সকলেরই মনে হবে, যন্ত্র শিল্পই বর্তমান রাষ্ট্রনায়কদের সুয়োরাণী। যন্ত্র-শিল্পের দিকটাতে সমারোহ প্রচুর, চাকচিক্য যথেষ্ট। প্রগতিকে কেউ বাধা দিতে পারে না। নানা রাজ্য স্টল খুলেছেন, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও বহু এসেছে। এলাকাতো বড় কম নয়, সাড়ে আট লক্ষ বর্গফুট।

কংগ্রেসনগরে এবারে যে প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে, তাকে বলা হচ্ছে 'শিল্প ও গ্রামোদ্যোগ' প্রদর্শনী। একদিকে আধুনিক শিল্পসম্ভার আর অন্য ধারটায় সর্বোদয়ের নানাবিধ নমুনা। যাঁর চোখ সরেস, তিনি প্রদর্শনীটাকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করে ফেলবেন, বৃহৎ শিল্প ও রাসায়নিক শিল্প, কুটিরশিল্প মানুষের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসমূহ, সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনা আর কৃষিজাত পণ্য। ডাঃ রায় বললেন, কংগ্রেস আর প্রদর্শনী এখন

ভিন্ন করে দেখা যায় না। সেই সুদূর অতীত থেকে এ দুটোর যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা অবিচ্ছেদ্য। আমার মনে পড়ে, ১৯০১ সালে বিডন স্কোয়ারে যে কংগ্রেস হয়েছিল, তাতেও একটা প্রদর্শনী ছিল। সহযাত্রী ভদ্রলোকটি শোনালেন, ১৯২৮ সালের পার্ক সার্কাস কংগ্রেসের প্রদর্শনীর কথা। বললেন, "এখনও চোখে ভাসে ভাই, সেই ভারতমাতার মূর্তিটি, এক হাতে ধান অন্য হাতে কার্পাস। মূর্তিটি ছিল পিতলের। বুঝলেন, ভলেন্টিয়ার হতে না পেরে, প্রদর্শনীর কাজে ভিড়ে পড়লুম, তাতেই সার্থক, সেই প্রথম ভিটামিন কথাটার চল হ'ল। মনে আছে, লাঠি হাতে করে সারাদিন ধরে অক্লান্তভাবে চেঁচিয়েছিলুম, ভিটামিনযুক্ত খাবার খান। পালং শাক, টমেটোতে খুব ভিটামিন, পালং শাক খান, টমেটো খান।"

তেনজিং, এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিংএর দিকে যে লোক ঝুঁকবে তার প্রমাণ অনেকবার পেয়েছি। বিশেষ করে ছোকরাদের মধ্যে। 'তেনজিং-এর স্টলটা কোনদিকে স্যর'? 'রিয়েল তেনজিং এসেছেন? নাকি তাঁর স্ট্যাচু?'

আধুনিক শিল্পের প্রদর্শনীর তাবৎ জায়গার তিন ভাগের এক ভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার জুড়ে বসে আছেন। কত মডেল, কত চার্ট আর কত মানচিত্র। পশ্চিমবঙ্গের ভূতভবিষ্যৎ বর্তমানের পরিচয় দিতে যা দরকার সব আনা হয়েছে সেখানে।

আর এত জাঁকজমকের অন্তধারে শান্ত ও সরল পরিবেশে সাজান হয়েছে, গ্রামোদ্যোগ ও সর্বোদয় প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে যে তোরণগুলো রয়েছে, তা বাইরেকার ওগুলোর মত অত বড় নয়, কিন্তু অভিনব, কিন্তু সুন্দর। বাঁশ আর খড় এই তো দুটো

জিনিস, এই দুটো জিনিসকে কত ভাল ভাবে কাজে লাগান হয়েছে। এই তোরণের উপর যে কৃষকের ছবিটি তা এঁকেছেন বুনিয়াদী শিক্ষা কেন্দ্রের এক শিক্ষক। সরল অথচ বলিষ্ঠ। সমগ্র প্রদর্শনীতে এই ছবিটিই আমার চোখে ভাল লাগল। কেন্দ্রভাগে ভূদান স্তূপ আর চারিধারে কৃষ্ণনগরের গড়া অজস্র মূর্তিতে গান্ধীজীর জীবনী। খাদির বাজারটাও এইদিকে।

"আদর্শ পরিবার দেখলেন নাকি?" প্রশ্ন শুনে ফিরে চাইলুম। আমাকে নয়। কথা হচ্ছে ওধারে। "দেখলুম। বেড়ে করেছে কিন্তু। ঘর বাড়ী পুকুর, সব্জীখেত, গরু। কর্তাকেও দেখলুম! বয়েস হয়েছে বেশ, ছিয়াত্তর সাতাত্তর হবে। কাঁথির ওধারে কোথায় যেন বাড়ী।" আরেকজন বললে, "জিজ্ঞাসাবাদ করলুম কি না, নিজে এসেছেন, স্ত্রী আছেন, ছেলে, ছেলের বৌ, মেয়ে, নাতিপুতি নিয়েই এসেছেন ওঁরা। কর্মীলোক কিনা। ক্ষুদিরামের বন্ধুলোক।"

এই ভাগ্যবানটির সঙ্গে আমারও আলাপ হয়েছে। নাম শশিভূষণ ভৌমিক। অভয় আশ্রমে ওঁর ছেলে—পূর্ণেন্দু ভৌমিক শিক্ষকতা করেন। গ্রামে থাকেন। এঁরা সব গ্রামকে আদর্শ করে আছেন।

গ্রাম-আদর্শ এককালে কংগ্রেসেরও ছিল। গান্ধীজী ছিলেন যন্ত্রশিল্পের বিরোধী। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেকের মত বিরোধ হয়েছিল। কল্যাণীতে কংগ্রেস যন্ত্রকে প্রাধান্য দিয়েছে, গ্রামকেও বাদ দিতে পারেনি। তাকেও রেখেছে। রেখেছে, তবে সমন্বয় করতে পারেনি। জোড় মেলাতে পারেনি। নেহরু যদি বর্তমান ভারত তো ভাবেজী হচ্ছেন অতীত। যদি কোনও সমন্বয়ী ভাবী

নেতৃত্বের আবির্ভাব না হয়, তবে এ জোড় মিলবে কি করে, কে জানে?

যন্ত্রশিল্পের যে আবহাওয়ায় গান্ধীজী, ভাবেজী, এমন কি নেহরু মানুষ হয়েছেন, তার চেহারা ছিল সর্বগ্রাসী। শিল্প ছিল কেন্দ্রীভূত। চারিপাশের সব কিছু রস নিংড়ে নিয়ে তবে এক বৃহৎ শিল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'ত। বৃহৎ শিল্পের মালিকানা থাকে মুষ্টিমেয় কজনের হাতে। বহুকে শোষণ করে কজনের মাত্র অর্থ বেড়ে ওঠে। এ যুগে অর্থনীতির চালনকাঠি যার হাতে, দুনিয়া তার হাতে। তারাই প্রভু। আর সবাই তার দাস। গান্ধীজীর চোখে এটা ধরা পড়েছিল। তিনি দেখেছিলেন যন্ত্র শিল্পকে কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য করে—আর কেন্দ্রীভূত শিল্প সাধারণ মানুষের কল্যাণ যতটা করে, তার চেয়ে ঢের বেশী করে শোষণ। দেখেছিলেন যন্ত্র-শিল্পের প্রতিষ্ঠা কি ভাবে মনুষ্যত্বকে বলি দিচ্ছে। তিনি তাই যন্ত্রবিমুখ হয়ে পড়লেন। বললেন, মনুষ্যত্বকে যদি যদি বাঁচাতে চাও, আত্মনির্ভর হও। নিজের যা প্রয়োজন, নিজে উৎপন্ন কর। এই হল গ্রামোদ্যোগ।

কিন্তু শিল্প তো প্রগতিও। যে উদ্ভাবক বাষ্প উদ্ভাবন করে-ছিলেন, যে ইঞ্জিনীয়ার বাষ্পকে কাজে লাগিয়েছিলেন, তাঁর চোখে তো শোষণের ছবি ছিল না। অজস্র লোককে তিনি কয়লার খাদে কাজ করতে দেখেছিলেন, নিজেও সেখানে কাজ করতেন, কয়লা বোঝাই গাড়ীগুলো বহু কষ্টে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে ঠেলতে হ'ত। ভাবলেন, বাষ্পকে ভৃত্য বানিয়ে তাকে দিয়ে যদি টানান যায়, তবে সহস্র লোকের শ্রম তো বেঁচে যেতে পারে। মানুষের শ্রম কমিয়ে তাকে আরাম দেওয়া, বিজ্ঞানের যদি আদর্শ কিছু থেকে

থাকে তা এই। শিল্পের এই কল্যাণের রূপ তো আজও নষ্ট হয়নি।

তাছাড়া আগে শিল্প ছিল বাষ্পনির্ভর। বয়লার ছাড়া বৃহৎ শিল্প কল্পনা করা যেত না। বাষ্পের যুগ শেষ হয়ে বিদ্যুতের যুগ এসে গেছে। বাষ্প শিল্পকে যতটা কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য করত, বিদ্যুৎ ততটা করবে না। বিদ্যুতের গতি সর্বত্র। সুদূরতম গ্রামেও তার গতায়াত। এই বিদ্যুতকে নির্ভর করে শিল্পকে যে বিকেন্দ্রীকৃতও করা যায়, সে সম্ভাবনা গান্ধীজীর সময়ে ছিল না। শিল্প মনুষ্যত্বকে খর্ব করে না, তাকে বিকাশ করতে সাহায্য করে। কেন্দ্রীভূত শিল্পেই মানুষ দাস হয়। কিন্তু বিদ্যুতের প্রয়োগ ঠিকমত করে গ্রাম বা শহরের প্রতিটি কুটিরকেই তো উৎপাদন কেন্দ্র করে তোলা যায়। গ্রামের সঙ্গে যন্ত্র শিল্পের গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া যায়। সমৃদ্ধিকে মুষ্টিমেয় ক'জনের হাতে বাঁধা না বেখে লক্ষ লোকের হাতে তুলে দেওয়া যায়। গান্ধীজীর স্বপ্ন ছিল সমৃদ্ধি একাব জন্য নয়, সকলের জন্য। শিল্পেব মূলগত আদর্শও তাই। কল্যাণীব প্রদর্শনীতে সরকারী পরিকল্পকদের চোখে এই সমন্বয়ের রূপবহস্য ধরা পড়েনি। তাই আমাব আশঙ্কা, দর্শকগণ প্রদর্শনীতে গিয়ে শুধু সেলাই মেসিন দেখবেন, বিজলী পাখা দেখবেন, দামোদর উপত্যকার নক্সা দেখবেন, গান্ধীজীর জীবন কাহিনীর পুতুল দেখবেন, আদর্শ গৃহস্থ দেখবেন। জীবনচর্যার ভবিষ্যৎ উপাদান দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে ফিরে আসবেন, এমন কোনো ব্যবস্থা নেই। অথচ নানা সমস্যায় জর্জরিত বর্তমান জীবনের পক্ষে একটা বলিষ্ঠ ইঙ্গিতের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী। যার কল্পনায় মানুষের আস্থা হত, যার নিশানা ধরে মানুষ এগিয়ে যেত, সেই এক ঈপ্সিত লক্ষ্যে, মানবতীর্থে।

"ছেড়েছে, মোসাই, এতক্ষণে ছেড়েছে, ব্বাপ্‌স্‌ কি যন্তন্না।" বাঙ্কের ছেলেটি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলে। ট্রেন চলতে শুরু করল। কংগ্রেস নগরের চকচকে সাইনবোর্ডটা ছাড়িয়ে গেলুম। কাতারে কাতারে তাঁবু পড়েছে, শিবির উঠেছে, নয়া কলকাতায়। সমগ্র ভারত এসে জড় হবে, তারই অভ্যর্থনার বিরাট আয়োজন, বিপুল সমারোহ। কল্যাণীতে কি সেই সমন্বয় ঘটবে—গ্রাম ও যন্ত্রের সমন্বয়? আকাঙ্ক্ষিত মানবতীর্থের এই কি সেই ভিত্তি!

ভারত-কংগ্রেস-নেহরু

"কল্যাণী গিয়েছিলে? কংগ্রেসে? কি দেখলে?"

কতবার এই সহজ প্রশ্নটার মুখোমুখি যে হলাম তার ইয়ত্তা নেই। সত্যি, কি দেখলাম কল্যাণীতে? সাধারণ লোক কি দেখতে গিয়েছিল? প্রচুর আলোর সমারোহ? প্রদর্শনী? কংগ্রেস অধিবেশন? না নেহরু?

১৬ই জানুয়ারী কল্যাণীতে প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। সরকারী-ভাবে সেইদিনটি থেকেই সাধারণের সঙ্গে কল্যাণীর সম্পর্কের একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়। সেদিনও কল্যাণীকে দেখেছি। আর ১৯ তারিখের রঙঢালা এক শীতের বিকেলে নেহরু যখন এসে পৌঁছালেন, সেদিনও দেখলুম কল্যাণীকে। অনেক তফাৎ। নেহরু আসা, না, প্রাণ আসা, স্পন্দন আসা, কর্মচাঞ্চল্য আসা।

কাঁচরাপাড়া স্টেশনের কাছে পুরনো এক বিমানঘাঁটি জঙ্গলে ঢাকা পড়েছিল। কংক্রীটের বিশাল রান-ওয়েটাতে আট বছর কোন বিমান নামেনি। ওয়াচ-টাওয়ারে কোন সতর্ক চক্ষু কারো প্রতীক্ষা করেনি।

"কি বলব মশাই, শিয়াল তাড়িয়ে তবে গে এইসব ঘরে ঢুকেছি। সব তাড়াহুড়ো করে করা। বাইরেটা মেরামত আর রং-পালিশ ঠিক করতেই সময় বেরিয়ে গেল। ভেতরটায় দু-পোঁচ কালি আর দু-'কোট্' রং কোনমতে লাগান হয়েছে। শুধু প্রধান মন্ত্রী আসছেন তা তো নয়, এই উপলক্ষে ক'দিনের জন্যে বিমান-

সার্বিসও খুলেছে। মাঝ থেকে দেখুন, বেতারযন্ত্রটি বিগড়ে বসেছে। দমদম থেকে খবরাখবর যা আসছে, ফোনে। এটি এখন ঠিক থাকে, তবেই বাঁচোয়া।" অফিসারটি হন্তদন্ত হয়ে অন্যধারে ছুটলেন।

পরিত্যক্ত বিমানঘাঁটিও কর্মমুখর হয়ে উঠেছে। বিমানঘাঁটির পরিচালক, ইঞ্জিনীয়ার, বেতারযন্ত্রী, বিমান-সার্বিসের লোকজন ব্যতিব্যস্ত। ঘন ঘন যাতায়াত। একজন আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন। বললেন, "আপনাদের সঙ্গে গাড়ি আছে? তাহলে একটু উপকার করুন না, কামরাজ নাদার এসে বসে আছেন, সেই কতক্ষণ থেকে, তাঁকে একটু পৌঁছে দিন না। অভ্যর্থনা সমিতির তো নো পাত্তা, কি কাণ্ড বলুন তো মশাই।"

আমাদের তাড়া ছিল। দুঃখের সঙ্গে তাঁর প্রার্থনা পূরণের অক্ষমতা জানিয়ে চলে এলাম।

কাগজে বেরিয়েছিল, নেহরু চারটে পঞ্চাশে আসবেন। কিন্তু তাঁর বিমান আগেই এসে পড়ল চারটে দশে। তাঁর সঙ্গে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী কাটজুও ছিলেন। তারপর খোলা জীপে ক'রে কল্যাণী এসে পৌঁছালেন। বিমানঘাঁটিতে অনেকের সঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ ছিলেন, নিখিল ভারত কংগ্রেসের সম্পাদকদ্বয় শ্রীবলবন্ত রায় মেহ্‌তা আর অধ্যাপক এস এন অগ্রবাল ছিলেন। যথানিয়মে সাংবাদিকরাও ছিলেন। এছাড়া, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সামরিক সজ্জায় দাঁড়িয়ে-ছিলেন। মাঙ্গলিক হস্তে উপস্থিত ছিলেন, কংগ্রেসের মহিলা কর্মিবৃন্দ। আর বিমানঘাঁটির তারের বেড়ার ওধারে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল নেহরু দর্শনপিপাসু মলিনবেশ সাধারণ নরনারীরা— কেউ বাস্তুহারা, কেউ রেল কলোনীর বাসিন্দা, কেউ বা কাছে-

পিঠের শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক পুরুষ ও নারী। তারা বেড়ার এধারে আসতে পারেনি। তবে নেহরু বিমান থেকে যখন নামলেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য শঙ্খধ্বনি হল, জয়ধ্বনি হ'ল মুহুর্মুহু,—"নেহরু কী জয়" তখন সেই জয়ধ্বনিতে এরাও গলা মিলিয়েছিল।

নেহরু বিমান থেকে নামলেন। তাঁকে খুব খুশী খুশী দেখাচ্ছিল। ডাঃ রায়কে আবেগের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন, দৃপ্তপদে স্বেচ্ছাসেবকদের দিকে এগিয়ে গেলেন, সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করলেন, জীপে গিয়ে দাঁড়ালেন, কোথাও একটু ক্লান্তির ছাপ দেখলুম না। নেহরু সম্পর্কে এক সহকর্মী বলেছিলেন, "নেহরু সব সময় প্রস্তুত, সব সময়ই তাজা যেন ঘন মোড়ক খোলা দার্জিলিং-এর চা।" তা কথাটা ঠিকই।

গোটা কংগ্রেসেই নেহরুর এই মূর্তি এবার সবাই দেখেছে।

বিশে থেকে চব্বিশে—এই পাঁচদিন কংগ্রেস অধিবেশন বসেছে। আয়োজনের এরকম ব্যাপকতা বাংলাদেশে এর আগে আর কখনো দেখা যায় নি। সহযোগিতাও সরকার পক্ষ থেকে যা দেওয়া হয়েছে তার তুলনা হয় না। রেল, পুলিশ ও ডাক বিভাগ তাঁদের যথাসাধ্য করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কর্মীর ভাণ্ডার যে শূন্য, এবারে, এই কংগ্রেসে তা প্রমাণিত হয়েছে। পঁচিশ বছর আগে বাংলায় যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল, সরকার ছিল বিরোধী, সমগ্র অধিবেশনটি সুশৃঙ্খল হয়েছিল, হ'তে পেরেছিল, শুধুমাত্র কংগ্রেসকর্মীদের অপরিসীম উৎসাহে আর অপূর্ব দক্ষতায়। এবারকার অধিবেশনও যদি কংগ্রেস-কর্মীদের পুরো কৃতিত্বে সমাধা হ'ত তো অনেকেই খুশী হতেন। একজন বৃদ্ধ কর্মী হতাশভাবে বললেন, "তেমন লোক কোথায়?" রেল আর ডাক বিভাগের

কথা ছেড়ে দিই। পুলিশেব কথা ধরুন। যানবাহন নিয়ন্ত্রণ থেকে নগর রক্ষার প্রতিটি ব্যবস্থায় পুলিশেব নিয়োগ বহু লোকেব দৃষ্টি-কটু ঠেকেছে। যদিও ভারতরাষ্ট্র এখন কংগ্রেস-নিয়ন্ত্রিত, তবুও কংগ্রেস তো আর ভাবত নয়, একটা দল মাত্র। রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে দলীয় কাজে ব্যবহার করা হলে গণতন্ত্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয় নাকি?

কিন্তু উপায় কি? শোনা গেল, কংগ্রেস সেবাদল গঠন করা হয়েছে। মাঝে মাঝে তাদের চেহারা দেখলাম, অনেক অকাজ করতেও দেখা গেল, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় কোন একটা কাজ তাদেব দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, এমন কথা কারো মুখে শোনা গেল না। প্রতিনিধিদের শিবির পাহাবা দেওয়া আর সভামণ্ডপ রক্ষাব দায়িত্বই বোধ করি এদের প্রধান দায়িত্ব ছিল। কিন্তু প্রতিনিধিদের শিবির থেকে চুরি হয়েছে, সভামণ্ডপের বেড়া ভেঙেছে। সেবাদলেব সদস্যদের কাছে পথের কথা জিজ্ঞেস করে বিদেশ থেকে যে সব প্রতিনিধি, দর্শক এসেছিলেন তাঁদের অনেকে উল্টোপথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিক্তবিরক্ত এক প্রতিনিধি অভিযোগ করলেন, "এই তো মশাই, সেবাদলের নমুনা। সে রাত্রে কি কেলেঙ্কারীটাই করলে। অন্য প্রদেশ থেকে লোক এসেছে তোমাদের রাজ্যে, তোমাদের অতিথি তারা, কোথায় তাদেব সেবা কববে, তা নয় কে একজন তাদের বুঝি বেয়াদবি করেছে, নাকি চোটপাট কবেছে, আর হৈ হৈ কবে ছুটে এসে বেধড়ক মার। নিজে গিয়ে তল্লাস করে দেখেছি, তিন চাবজন জখম হয়েছে। ওদের রাজ্য কংগ্রেস কমিটির যে সাইনবোর্ড ছিল তা সুদ্ধু ছিঁড়ে ফেলেছে, লাঠির ঘায়ে শিবিরের বেড়া ফাঁসিয়ে দিয়েছে আচ্ছা বলুন, এসব কি সেবা-দলের কাজ? এতদিন ধরে কংগ্রেসে আছি, কোনদিন মশাই, এ

সমস্ত লোকের মুখ দেখিনি, রাতারাতি সব সেবাদল হয়ে গেল। লজ্জায় মাথা কাটা গেল না ?"

"এবারকার কংগ্রেসে খুচ্‌রো দর্শকই বেশী এসেছে।" একজন উদ্যোগকারী জানিয়েছিলেন। বললেন, "প্রতিনিধির সংখ্যা আমরা আরো বেশী আশা করেছিলুম। এ আই সি সি-র সদস্যই অনেক আসেনি। তবে সব ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছে সাধারণ সভা দুটোতে। জায়গার ব্যবস্থা রাখলেও, এত লোক হবে, তা আশা করেনি।"

তবে, এটা ঠিক যে, কংগ্রেস শুনতে তত নয়, যতটা এদের আগ্রহ নেহেরুজীকে দেখতে। তাই সাধারণ অধিবেশনে এত ভীড়। বিষয় নির্বাচনী সমিতি, রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে বহু আসন শূন্য ছিল। চিরপরিচিত কয়েকটা মুখও এবার অনুপস্থিত দেখলুম। বিশেষ করে প্রবীনতম তিনজন। আজাদ আসেননি ট্যণ্ডন আসেননি আর আসেননি রাজাজী। আজাদ অসুস্থ। রাজাজীও তাই। যে কংগ্রেসে পাক মার্কিন সামরিক চুক্তির মত গুরুতর বিষয় নিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল, সে সম্মেলনে রাজাজী অনুপস্থিত। তাঁর পাকা মাথার পাকা পরামর্শ এবার পাওয়া গেল না! কিছুদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহ-সভাপতি মিঃ নিক্সন ভারতে এসেছিলেন। সর্বপ্রথমে তিনি রাজাজীর সঙ্গে দেখা করেন। সাংবাদিক মহলের কেউ কেউ বললেন, আমেরিকার বিরুদ্ধে এত আওয়াজ রাজাজীর পছন্দ নয়। রাজাজীর অনুপস্থিতির কারণ কি তাই ? না তিনি অসুস্থ।

পুরনো যাঁরা তাঁরা না আসুন, তত ক্ষতি হয় না। কিন্তু নতুন মুখ ? তেমন নতুন মুখের আমদানি না হলে, কংগ্রেসের প্রাণের স্রোত যে শুকিয়ে যাবে।

১৯শে নেহরু এলেন। তাঁর আগমন বার্তা ব'য়ে নিয়ে সেইদিন

আমরা ক'জন কল্যাণী থেকে গেলাম। ২১ তারিখে আমরা আবার যখন কল্যাণীতে গেলাম, তখন কল্যাণী ভিজে শপ্ শপ্ করছে। ভোর রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, আকাশ তখনও মেঘে ঢাকা বাতাস বইছে, জলো বাতাস। আর মাঠ, মণ্ডপ, শিবির নেতাদের বাসস্থান, দোকানপাট ভিজে শপ্ শপ্ করছে। ইস্কুল বাড়িতে নেতারা ছিলেন, নেহেরু ছিলেন আলাদা নতুন তৈরী এক দোতলা ভবনে, সব কোঠাবাড়ি, সব নতুন তৈরী, তবু তার ছাত ফুটো হয়ে জল পড়ে ঘর ভেসেছে, নেহরুর দরকারী কাগজপত্র অন্যত্র সরাতে হয়েছে। ইঞ্জিনীয়ারদের কারসাজি না বৃষ্টির কৃতিত্ব? একজন রসিকতা করে বললেন, "নেহরুকে দেখতে এসেছে মশাই। বৃষ্টির কি আর সাধ যায় না।" কথাটা ঠাট্টাই। তবুও সত্য। নেহরুর দর্শনপ্রার্থীর, সান্নিধ্যপ্রার্থীর সংখ্যাই এবারকার কংগ্রেসে বেশী। "নেহরু একটা এক্স্পেরিমেন্ট করে দেখুন, একবার উনি অনুপস্থিত হোন দেখি, কংগ্রেসে সিকি লোক আসে কি না? আরে মশাই, অর্দ্ধেক লোক এসেছে নেহরুকে দেখতে, আর অর্দ্ধেক একজিবিশন।" ভদ্রলোক বললেন, "প্রস্তাব রচনা থেকে আর সাধারণকে ঠেকান্, এই একটি লোকই করেছে। প্রধান মন্ত্রীও যে কংগ্রেস-সভাপতিও সে। ভারতই বলুন, কংগ্রেসই বলুন, এক নেহরুর মধ্যেই সব গিয়ে জড় হয়েছে।"

কথাটা খুব ভেবেছি। অনেকদিনের সংগ্রামে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। গণতন্ত্র সার করে যাত্রা করেছি সাফল্যের দিকে, মুক্তির দিকে। স্বাধীনতার দুটো দিক—দেশগত আর লোকগত। দেশের স্বাধীনতা আর দেশের লোকের স্বাধীনতা তো এক জিনিস নয়। দেশ স্বাধীন হলে পরে অবশ্য লোকের স্বাধীনতা আসবার সম্ভাবনা

দেখা দেয়। তা-ও কখন? না গণতন্ত্র যখন কার্যকরী হয়। কোনও একজনের উপর বেশীমাত্রায় নির্ভর করা মানে গণতন্ত্রকে অস্বীকার করা। নেহরু নির্ভর কংগ্রেস, নেহরু-নির্ভর ভারত আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? একটি নায়কের উপর একান্তভাবে নির্ভর করাই তো এক নায়কত্ব স্বীকার করা। যে নেতা রাষ্ট্রের কর্ণধার, তিনি গণতন্ত্রবাদী এটুকুই গণতন্ত্রের রক্ষাকবজ নয়। গণতন্ত্র সম্পর্কে সচেতনতা প্রতিটি লোকের, অন্তত অধিকাংশ লোকের অস্থিতে-মজ্জায় ঢুকিয়ে দিতে হবে। রাষ্ট্র এ দায়িত্ব নিতে পারে না। এ দায়িত্ব নিতে পারে পার্টি। যে পার্টির হাতে আজ রাষ্ট্রের শাসনভার, তারই কর্তব্য এই কাজে এগিয়ে আসা। কিন্তু দুঃখের কথা, আফ-সোসের কথা কংগ্রেসে এ বিষয়ে একটু আলোচনাও হ'ল না। অনেকের সঙ্গেই কথা হল। ভাবী নেতৃত্বের কথাও উঠল। চিন্তিত, সবাই চিন্তিত। নেহরুর অবর্তমানে যে নেতৃত্ব আসবে, তার স্বরূপ কি? তার চেহারা কি?

নেহরুর আশেপাশে যারা, তারা অনেক নিষ্প্রভ। সর্বভারতীয় নেতৃত্ব করার মত চেহারা কারোরই নেই। আজাদ, রাজাজী আরো বৃদ্ধ। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, পণ্ডিত পন্থ তথৈবচ। তবে কে? এস কে পাটিল? মোরারজী দেশাই? কিদোয়াই? অথবা আর কেউ?

যেই হোন, এখনও তিনি তিমিরে। ফিসফিসানির স্তরেও আসেননি। কংগ্রেস এই অধিবেশনে এমন কোনও কার্যসূচী গ্রহণ করেনি, যাকে আশ্রয় করে ভাবী নেতৃত্ব গঠন করার দিকে সে এগিয়ে যেতে পারে।

নেহরু আশাবাদী। কল্যাণীর আকাশ থেকে মেঘের আড়ম্বর

সরে গেল যখন, ঝিলিক দিয়ে সূর্য উঠল ফের। ঘটনাটাকে তিনি ইঙ্গিত বলে ধরে নিলেন। সূর্যের দিকে চেয়ে বললেন, তিনি আশা রাখেন, ভারতের আকাশ থেকেও এমনিভাবে সব দুর্ভাবনার সব দুর্যোগের মেঘ কেটে যাবে। অনাগত দিনের সমৃদ্ধি ও সুখের সূর্যটাকে তিনি যেন ঝলমল করতে দেখলেন। সভাপতির ডেস্কে সমস্ত দেহভার রেখে, জনতার উপরকার শূন্যপথ বেয়ে তাঁর দৃষ্টি মাঝে মাঝে দিগন্তে গিয়ে নিবদ্ধ হচ্ছিল। সে দৃষ্টি মাঝে মাঝে উদাস, আবার কখনো বা সুতীক্ষ্ণ সন্ধানী।

যে বিরাট দায়িত্বের ভার ভারতের কাঁধে, লক্ষ লোকের কাঁধে যা ভাগ হয়ে যাবার কথা, তা নেহরু একা তাঁর কাঁধে তুলে নিয়েছেন, এতে তাঁর বিরাট ক্ষমতার যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি শঙ্কা জাগে তবে নেহরুর পরে কি মহাপ্রলয়?

পরের কথা পরে। আপাতত এখনকার কথা হোক। ২৩শে জানুয়ারী কল্যাণীতে যে দৃশ্য দেখেছি, তা ভুলবনা। ভোর থেকে লোক আসতে শুরু হ'ল। অগণিত লোক। হেঁটে, সাইকেলে, বহু আগে বর্জন করা ঘোড়ার গাড়িতে, গরুর গাড়িতে, ট্রেনে, বিমানে, নানাবিধ জলযানে। কংগ্রেস নগরে অসংখ্য রাস্তা। কিন্তু কোনটাতেই গায়ে গা না ঠেকিয়ে যাওয়া যায় না। খাবারের দাম চড়তে লাগল। ভিড় বাড়তে লাগল। সারাদিন ঘুরছি। লোক লোক আর লোক আর অগণন মোটরগাড়ি। প্রাইভেট গাড়ি রাখবার জন্য নগর কর্তৃপক্ষ পাঁচটি জায়গার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তা ছাপিয়ে পড়েছিল। এখানে ওখানে যেখানে সেখানে মোটর। ট্রেনের ছাতে লোক। স্পেশ্যালের পর স্পেশ্যালের বন্দোবস্ত করেছিলেন রেল কোম্পানী। কিন্তু তাতেও কুলোয়নি। ভিড়ের ঠেলায় শেষ

পর্যন্ত রেল-কর্তৃপক্ষ প্রোগ্রাম বদল করতে বাধ্য হলেন। কংগ্রেস-নগর পর্যন্ত সরাসরি আর সব স্পেশ্যাল চালাতে পারলেন না। কলকাতা থেকে কল্যাণী ষ্টেশন—স্পেশ্যালগুলো আসতে লাগল। আর কল্যাণী থেকে একখানা গাড়ী কংগ্রেসনগর পর্যন্ত খেপ লাগাল। তবুও কি বন্দোবস্ত করা সহজ? লাইনের ক্ষমতা শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে, গাড়ীর ষ্টক ফুরিয়ে গেছে। তবু গাড়ি চাই। ষ্টেশন মাস্টারকে ঘিরে ফেলেছে জনতা। উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। টিকিট কেটেছি কংগ্রেসনগরের, ট্রেনে জায়গা নেই, চালাকি নাকি? কি মশাই, আমাদের যাবার ব্যবস্থা করুন। ব্যবস্থা আব কি করে করব, ট্রেন তো দিয়েছি। দিয়েছেন বললেই হল, জায়গা কোথায়, উঠবো কি করে? একটু অপেক্ষা করুন দয়া করে, ডবল ইঞ্জিন লাগান গাড়ি যাবে, লোক নামাবে আর ফিরে আসবে। ওসব গুলতাপ্পি ছাড়ুন, যাবার ব্যবস্থা করে দিন। কিচ্ছু জানিনে। হৈ হৈ শুরু হ'ল। স্টেশন ঘরে চড়াও হয় আর কি? অসহায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর কি করবেন? অসহায় জনতা যুক্তি বোঝে না। খানিক পরে ভিড় যখন কমে গেছে, এগিয়ে গেলুম তাঁর কাছে। বৃদ্ধ বললেন, "আপসোস, আপসোস, লেখাপড়া জানাদেরই যদি এই ব্যবহার, তো দেশের ভবিষ্যৎ কি? এই ক'দিন ধরে অনেক কিছু দেখলুম ভাই। দিন চারেক হল স্টেশনটা খুলেছে, অবস্থা দেখুন। গাছপালা ছিঁড়ে, দেওয়ালের পলেস্তারা খসিয়ে যা তা করেছে। অশিক্ষিত লোকেরা তবুও কথা শোনে, কিন্তু এই এজুকেটেড, কলেজ পাশ, সুটপরা এদের সামলান বিষম দায়। ট্রেন থেকে নামল তো গেটের দিকে একসঙ্গে দৌড়, কে মরল, কে চিপ্‌টে গেল, ভ্রূক্ষেপ নেই। কাল দুটি মহিলাকে পিছন থেকে

এমন ঠ্যালা মারল যে, পড়ে গিয়ে একজনের দাঁত ভেঙেছে, আর একজন তো ফিট। আমরা শেষে সেবা শুশ্রূষা করি। দেশটা তবে কার? কোনো জিনিষে মায়া নেই। কারো উপর দরদ নেই। এরা কারা? এদের দিয়ে কি হবে বলতে পারেন? আমাদের ভারতের বাণী হচ্ছে, আত্মানং বিদ্ধি—Know thyself - তা সেটা দেখছি এরা সবাই, এই ইয়ং জেনারেশন খুব আয়ত্ত করেছে, নিজেকে ছাড়া আর কিছু জানে না!"

দুপুরের দিকে যা হোক, বিকাল থেকে জনস্রোত আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। সাধারণ অধিবেশন একদিকে, আর অন্যদিকে প্রদর্শনী—ভিড়ের স্রোত দুভাগ হয়ে গেল। আর এতে যাদের মতি নেই, সেই 'তামাশা দেখনেওয়ালা'রা মোটর থেকে সতরঞ্চি আর খাবারের বাণ্ডিল বের করে, পছন্দসই জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লেন হেথাসেথা। আমরা, দুজন সাংবাদিক বেরিয়েছিলুম, অবস্থাটা সরেজমিনে দেখতে। সন্ধ্যের মুখে মোটরে করে কংগ্রেস-নগরে ঢোকা অসম্ভব হয়ে গেল। দেড় মাইল পথ আসতে আমাদের প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগল। বুঝলুম, পুলিশের যান-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে গেছে! বিশৃঙ্খলার নগ্ন মূর্ত্তি এখানেও দেখলুম কি প্রকট। কোনও মোটর আরোহীর সামান্য মাত্র ধৈর্য নেই। ধৈর্য ধরে একের পিছনে অন্যে চললে ধীরে ধীরে যে পথটুকু অনায়াসে পার হওয়া যায়, কে কার আগে যাবে, তার জন্য তাড়াহুড়ো করে সমস্ত পথ বন্ধ করে এক কেলেঙ্কারী করে বসলে। পুলিশ - নির্বাক দর্শক।

ভিড় শুধু বাইরেই নয়, সাধারণ অধিবেশনের জন্য যে বিরাট খোলা মণ্ডপ বানান হয়েছিল, তার টিনের বেড়ার উপর, ফটকের

উপর ভিড়ের চাপ প্রচণ্ডভাবে পড়তে লাগল। স্বেচ্ছাসেবকের সাধ্য হল না, সে ভিড় সামলায়, পুলিশের মদত জরুরী হয়ে পড়ল। কিন্তু পুলিশও পারলে না। নেহরুকে দেখবার জন্য সকাল থেকে প্রতীক্ষা শুরু হয়েছে। এত কাছে নেহরু। এক টিনের বেড়ার ব্যবধান। কে মানা মানে? ভিড়ের চাপে টিন আর্তনাদ করে উঠতে লাগল, হট্টগোল শুরু হ'ল। কর্তৃপক্ষ গেট খুলে দিতে বাধ্য হলেন। জনতা প্লাবনের মত ভিতরে ঢুকে পড়ল। ফটোগ্রাফারদের ছবি তোলবার সুবিধের জন্যে এক উঁচু মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল। যাঁরা এই সময় সেই মঞ্চের উপর দাঁড়িয়েছিলেন, দৃশ্যটা তাঁরাই উপভোগ করেছেন। একজন বললেন, "সমুদ্রের ঢেউ। বুঝলেন, হাজার হাজার মাথা পিছন থেকে যখন বেড়া টপকে টপকে এগিয়ে আসছিল সামনের দিকে, তখন অবিকল সমুদ্রের ঢেউ-এর মত লাগছিল। আর মশাই, সেই অশান্ত, সেই উত্তাল জনতা, একটি কণ্ঠস্বরে শান্ত হয়ে গেল, স্তব্ধ হয়ে গেল। নেহরু যখন বললেন, 'শান্ত হোন, বসে পড়ুন, আমরা কাজ চালাতে পারছিনে।' অমনি ধীরে ধীরে সবাই বসে পড়ল। তাজ্জব!"

শুধু তাই নয়। ভিড়ের চাপে সভার কাজ চালান যখন বন্ধ হয়ে গেল, তখন জনতা বায়না ধরলে, তারা নেহরুর ভাষণ শুনবে। আবার চাঞ্চল্য জাগল তাদের মধ্যে, গোলমাল শুরু হল। তখন নেহরু আবার এক কাণ্ড করে বসলেন। বললেন, "বক্তৃতা দিতে পারি, তার আগে জনতাকে এক পরীক্ষা দিতে হবে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি যাব, আপনারা কেউ উঠবেন না, গোলমাল করবেন না, শুধু শান্তভাবে সরে সরে গিয়ে আমার যাবার জন্য একটা অনায়াস পথ করে দিতে হবে।"

তাই, তাই স্বীকার। অনেক সাবধানী নেতা নেহরুকে এ খেলা করতে নিষেধ করলেন। কেউ কেউ বাধা দিতে এলেন। নেহরু তাঁদের ধমক দিয়ে নিরস্ত করলেন। তারপর দ্রুতপদে মঞ্চ থেকে নেমে জনতার সমুদ্রে প্রবেশ করলেন। সমুদ্র দু'ভাগ হয়ে তাঁকে রাস্তা দিল। দৃঢ় পদক্ষেপে নেহরু শেষ পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এলেন। নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাসী, সাফল্যে কিছুটা বা গর্বিত নেহরু ঘোষণা করলেন, "জনতা পরীক্ষায় পাশ করেছেন, তবে নম্বর পুরো একশ' মেলেনি।" পাঁচজন তাঁর পায়ের ধুলো নিতে যাওয়ায় নেহরু পাঁচ নম্বর কেটে নিয়েছেন। উত্তেজনার বদলে শান্তি এসেছিল, নেহরুর ঘোষণায় ক্ষোভ কেটে গিয়ে হাসি-ঝলমল হয়ে উঠল আবহাওয়া। সেই রাত্রে সাংবাদিকদের হোটেলে খাবার সময় একজন বলে উঠলেন, "রাজা ক্যানুটের গল্প পড়েছিলুম, তিনি ঢেউ থামাতে চেয়েছিলেন পারেন নি, নেহেরুকে দেখলুম, তিনি ঢেউ থামালেন।" আর একজন টিপ্পনি কাটলেন, "তাহলে মুশাই বা বাদ যান কেন? সমুদ্রও তো দু'ভাগ হয়ে মুশাকে পথ করে দিয়েছিল।"

নেহরু তাঁর কথা রেখেছিলেন। আরেকটি সভা হ'ল তারপর। নেহরু বললেন, "এটা সভাপতিহীন সভা।" শ্রীমতী বিজয়-লক্ষ্মীকে নেহরু ডাকলেন। বক্তৃতা দিতে এসে তিনি মাইকের নাগাল পেলেন না। নেহরু টিপ্পনি কাটলেন। জনতা হেসে উঠল প্রাণভরে। শেষে জলচৌকীর উপরে বালিশ তার উপরে দাঁড়িয়ে বিজয়লক্ষ্মী বক্তৃতা দিলেন। বক্সী গোলাম মহম্মদও এক ভাষণ দিলেন।

ভুলব না, সেই রাত্রির কথা। দুর্জয় শীত, আর সেই

শীতের মধ্যে কয়েক সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার দুর্ভোগ। রাত সাড়ে দশটায় হি-হি শীতে টহল দিতে বেরিয়েছি। বাস স্ট্যাণ্ডে, রেলস্টেশনে তখনও লোকের ভিড়। সরকারী বাসের অফিস ঘেরাও। সরকারী বাসের স্টক ফুরিয়েছে, তাঁরা করবেন কি? "আমরা কি করব, মানে কি মশাই!" জনতার উত্তেজনা উচ্চরোলে ফেটে পড়ে। "বাসের বন্দোবস্ত করুন। কর্তাদের বলুন। নইলে কি মেয়েছেলে নিয়ে এই শীতে জমে মরব?" বাস স্টাণ্ডের এক মাতব্বর ব্যক্তি বললেন, 'বলুন তো কি করি, ডাঃ রায়কে ফোন করলুম। তিনি বললেন, 'তোমরা আর কি করবে? ট্রেন ছাড়া আর কারো সাধ্য আছে, এই ভিড় সরাবার? মাঝখান থেকে বাসগুলো যাবে।' তবুও কলকাতায় ওয়ারলেসে খবর দিয়েছি, কিছু বাস আসতে পারে।"

খাবার নেই কোথাও। সব ফুরিয়ে গেছে। হন্যে হয়ে খাবার খুঁজছে লোক। আট আনার খাবার তিন টাকায় বিক্রী হয়েছে। দু আনার চা-এর দাম উঠেছিল ছয় আনা, আর এক সের ভাজা ছোলা, তার দাম চার টাকা। তাই লোকে কিনেছে। ক্ষিধের চোটে তাই গোগ্রাসে গিলেছে।

কংগ্রেসনগর স্টেশনটা নিঝুম। সকালে দুটো স্পেশালে করে কলকাতার বিভিন্ন ইস্কুল থেকে শিশুরা এসেছিল—৩।৪ হাজার শিশু। অনেক আশা করে এসেছিল নেহরুর সান্নিধ্য পাবে বলে। কিন্তু তাদের বুড়ো অভিভাবকদের হ্যাংলামিতে, আত্ম-প্রচারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শিশু উৎসব পণ্ড হয়েছে। তাদের ফিরে যাবার কথা ছিল স্পেশালে করে পাঁচটায়। কিন্তু কংগ্রেসনগরে যাত্রী আনতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ায় ট্রেনের টাইম টেবল বানচাল

হয়ে যায়। একটা স্পেশালে কোনমতে ঠাসাঠাসি করে হাজার আড়াই রাত দশটায় রওনা দিয়েছে। বাকীগুলি এখানে-ওখানে ছিটকে পড়েছে। স্টেশনের একটা ঘরে গাদাগাদি করে পড়ে আছে কিছু। ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন, শীতের পোষাক আনেনি, ঠকঠক করে কাঁপছে। কেউ ভয়ে, কেউ ভাবনায় কাতর। সঙ্গে গার্জেন হয়ে এসেছেন যাঁরা, তাঁরা বিব্রত, হতাশ। কোথায় শিশু উৎসবের পরিচালকগণ? কোথায় বা অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যবৃন্দ? নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তাগণ? আশ্চর্য লাগল, তাঁরা অনুপস্থিত দেখে।

ঠিক জানিনে, শোনা কথা, অনেক রাত্রে নাকি নেহরুর ফোন বেজে উঠেছিল। এক ইস্কুলের বিপন্না এক শিক্ষিকা নেহরুর শরণ নিয়েছিলেন। সব শুনে তিনি মৃদুলা সরাভাইকে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেন। তবে তার একটু পরেই একখানা স্পেশ্যাল ট্রেন আসে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সক্রিয় চেষ্টায়। তাতেই সব ভিড় পরিষ্কার হয়ে যায়।

নেহরু, নেহরু আর নেহরু। কংগ্রেসের সর্বত্রই এক মূর্তি। একটি আশ্রয়। একটি ভরসা। কল্যাণী কংগ্রেসের যদি কিছু দেখবার থাকে, তবে তা এই।

ট্রেনে যে বৃদ্ধ টিকিট কেটেও উঠতে পারে না, সেও নেহরুকে নালিশ জানায়, ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যে সভ্য সংশোধনী প্রস্তাব আনেন তিনিও চোখ দু'টো নেহরুর দিকে রেখে প্রস্তাব পেশ করেন।

একজন প্রবীণ সাহিত্যিক এবং সাংবাদিককে কথাটা বলতেই তিনি বলেছিলেন, "যিনি নির্ভরযোগ্য তাঁর উপর নির্ভর করতে দোষ কি?"

ভারত আজ ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারত যে শান্তির নীতি বেছে নিয়েছে তা বলিষ্ঠ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে। প্রচণ্ড দুই শক্তিজোটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভারতই বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করছে, যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই। পাকিস্থান আমেরিকার সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত যুদ্ধকামী এক রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। ভারতের পক্ষে এ এক শঙ্কার কথা। বিভিন্ন প্রস্তাবে এই সব পরিস্থিতির 'পরে জোর দেওয়া হয়েছে।

বিষয়-নির্বাচনী সমিতির সভায় নেহরু যখন উচ্চগ্রামে গলা তুলে বললেন, "ভয় আমরা কাকেও করিনে। নিঃসংশয়ে, আন্তরিকভাবে বলছি, মহান্ জাতিরূপে আমরা কারো ভয়ে বিন্দুমাত্র ভীত নই।" ভারতের পররাষ্ট্র নীতি এই শান্তির নীতি, নিষ্ক্রিয় মনোভাব প্রসূত নয়, তা প্রাণস্পন্দিত, সমগ্র পৃথিবী একদিন তার মর্ম বুঝবে বলে নেহরুর বিশ্বাস।

আজ যখন কল্যাণীর কথা মনে পড়ে তখন এই নেহরুকে মনে পড়ে। নেহরুর এই দুর্জয় আত্মবিশ্বাসকেই মনে পড়ে।

জীবনের উৎস

১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী, সোমবার, গরাণহাটার এক বাড়ীতে হিন্দু কলেজের পত্তন হল! এইদিন থেকে বাংলা দেশে তথা ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হল। নবচেতনার উন্মেষ হল দেশীয় লোকের মনে। হিন্দু কলেজ নবজাগরণের উৎস। তাই এই দিনটি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে স্বর্ণক্ষণ।

তার সতের বছর আগে (১৮০০) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পত্তন হয়েছে। কিন্তু তাতে দেশীয় লোকদের কোন সুবিধে হয়নি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ইংরেজ রাজপুরুষদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য।

সেই আমলে পর্বতকেই বার বার মহম্মদের কাছে আসতে হত, ইংরেজ রাজপুরুষদেরকেই দেশীয় ভাষা শিখতে হত।

ইংরেজী শিক্ষা আমাদের জাতীয় চেতনা উন্মেষের যে মূল কারণ, এ বিষয়ে কোন ভুল নেই।

পলাশী যুদ্ধের সময়ে আমাদের জাতীয় শিক্ষা বলতে কিছু ছিল না। দরবারের ভাষা ছিল ফার্সি! আর সংস্কৃত ছিল উচ্চ বর্ণের গোটাকয় টুলো পণ্ডিতের তালপাতার পুঁথির মধ্যে আবদ্ধ। জ্ঞানের আলো বহু বছরের জমা কুসংস্কারের ঘেরাটোপে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল!

উনিশ শতকের প্রারম্ভে সরকার ডাক্তার ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টন নামে এক কর্মচারীকে কোনও কোনও বিষয়ে তথ্য

সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করেন ! ডাঃ হ্যামিল্টনের বিবরণ থেকে জানা যায় দেশের কোনও কোনও স্থানে সংস্কৃতের চর্চা কিছু ছিল বটে, কিন্তু তাও কেবল ব্যাকরণ, স্মৃতি ও ন্যায়ের শিক্ষাতে পর্যবসিত হত। যে জ্ঞানের দ্বারা হৃদয় মন সমুন্নত হয়, জগৎ ও মানবকে বুঝবার সহায়তা হয়, এমন কোনও জ্ঞানের অস্তিত্ব তখন দেশে ছিল না।

এই জ্ঞান লাভ করবার জন্যে দেশের লোকের মনে ক্রমশঃ তৃষ্ণা জেগে উঠতে লাগল। সব থেকে মজার কথা এই যে তখনকার সরকার প্রথম দিকে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারে বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না। তাঁরা প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাই টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা তাই মৌলবী বানাবার জন্য মাদ্রাসা আর পণ্ডিত বানাবার জন্য সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করলেন।

কিন্তু দেশীয় লোকের জ্ঞান-তৃষ্ণা ওতে মিটল না। ইংরেজ রাজত্ব যতই কায়েম হতে লাগল, ততই কলকাতার পসার বাড়তে লাগল। দলে দলে ইংরেজ বেনে কলকাতায় এসে জুটতে লাগল। হু হু করে ব্যবসা বাণিজ্য বেড়ে উঠতে লাগল। কলকাতায় এক নতুন সমাজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। আমাদের দেশের সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে এ সমাজের আদলের অনেক গরমিল দেখা দিল। এঁরাই নব্য কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা মধ্যবিত্ত, বাবু। আধুনিক বাঙ্গালী কেরাণীকুলের এঁরাই হলেন পিতামহ।

ইংরেজ বেনেদের সঙ্গে ব্যবসায় সূত্রে এঁদের তখন দহরম মহরম খুব। এঁরা তাঁদের বেনিয়ান, সরকার, মুৎসুদ্দি, হৌসেব হিসেবনবিশ। মনিব খাস বিলেতের আমদানী। কি যে বলে, বোঝা মুশকিল। কাজ-কারবারে বিলক্ষণ ঝঞ্ঝাট। মনিবের ভাষা

বুঝলে মন-রাখা সোজা। আর যদি বলতে পার ছিটেফোঁটা তবে তো তুমি তার নয়নের মণি।

প্রথম তাগিদ, ইংরেজী শেখার তাগিদ এল এঁদের কাছ থেকে। হাতে এঁদের কাঁচা পয়সা যথেষ্ট। সমাজের মাথা বলতেও এঁরা। কাজেই শুধু রব তুলেই ক্ষান্ত হলেন না। ইস্কুল বানাবার জন্য তোড়জোড় করতে লাগলেন সব।

কয়েকজন ফিরিঙ্গী দেখলেন দেশের হাওয়া যেমন বইছে, তাতে ইংরেজী শেখার ইস্কুল খুললে তো মন্দ হয় না। দু পয়সা ঘরে আসে। ওঁরাই প্রথম কলকাতায় ইস্কুল খুলে বসলেন, প্রাইভেট ইস্কুল।

সার্বরণ সাহেবের ইস্কুল ছিল চিৎপুরে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এই ইস্কুলের ছাত্র। সুপ্রসিদ্ধ মতিলাল শীল ছিলেন মার্টিন বাউল সাহেবের ছাত্র। ওঁর ইস্কুলটা ছিল আমড়াতলায়। আরেকটা নামকরা ইস্কুল তখন ছিল, আরটুন পিট্রাস্ সাহেবের। তাঁর দুই ছাত্রের তখন শিক্ষিত বলে সমাজে বেশ নাম-ডাক ছিল। এঁরা হচ্ছেন কলুটোলার দুই সেন—কানা নিতাই সেন আর খোঁড়া অদ্বৈত সেন। এঁবা ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বলতে পারেন। তাই এঁদের ছিল প্রায় লাটসাহেবের মতই খাতির। বিয়ে, পূজো, যাত্রা উৎসব— সব কিছুতেই এঁরা নিমন্ত্রণ পেতেন। আর সম্মান বজায় রাখবার জন্য কাবা, চাপকান, জরির জুতো পরে হাজির হতেন সে সব যায়গায়।

তখনকার কলকাতার বড় শিক্ষিত কে? যার যত ইংরেজী শব্দ মুখস্থ সে। যেমন আমরা পাঠশালায় সুর করে শতকিয়া মুখস্থ করি —একজন প্রথমে চেঁচায়, আটের পিঠে সাত—আর অন্যেরা

সমস্বরে জবাব দেয় "সাতাশী" আটের পিঠে আট—"অষ্টাশী"। কি ধরুন নামতা পড়ি—"সাত আটটা ছাপ্পান্ন", "সাত নয় তেষট্টি"; ঠিক তেমনি করে তখনকার দিনে ইংরেজী শেখান হত।

"ফিলজফার ?" সর্দার পড়ো বললে তো আর সবাই জবাব দিল "বিজ্ঞ লোক" "প্লৌম্যান ?" "চাষা।" "পমকিন ?" "লাউ কুমড়ো।" "কুকুম্বার ?" "শসা।"

এই শিখলেই তখনকার দিনের "এম এ" পাশ হয়ে গেল। সাহেবদের সঙ্গে কথা বলতে পারলেই যথেষ্ট। তাতেই বেতন বৃদ্ধি। আর কি চাই।

এক সাহেবের ঘোড়ার দানা কমতে লাগল। ঘোড়াও রোগা হতে লাগল। সাহেব সহিসদের ধমকালেন, ঘোড়ার দানা যাচ্ছে কোথায় ? সহিসরা বলল, হুজুর, আপনার বাবু ঐ দানায় টিফিন খাচ্ছেন। সাহেব তো অবাক। বললেন, বোলাও বাবুকো। বাবু এসে দাঁড়াতেই সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "নবীন, তুমি নাকি আমার ঘোড়ার দানাতে টিফিন কর ?"

বাবু ইংরেজীতে জবাব দিলেন, "ইয়েস স্যার, মাই হাউস মার্নিং এণ্ড ইবনিং টুয়েন্টি লীভস ফল, লিটিল লিটিল পে, হাউ ম্যানেজ ?" অর্থাৎ আমার বাড়িতে সকাল সন্ধ্যে কুড়িটে পাত পড়ে, এত অল্প মাইনেয় চলে কি করে ? শুনতে পাওয়া যায়, বাবুর উন্নতি এতেই হয়েছিল।

বাবুদের উন্নতি ওতে হলেও শিক্ষার উন্নতি হয় না। দেশীয় লোকেরা শিক্ষা, প্রকৃত শিক্ষালাভের জন্য সত্যিই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন।

এমন সময় রাজা রামমোহনের আবির্ভাব হল কলকাতায়।

১৮১৪ সন বাঙ্গালীর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সাল। ঐ বছরই রাজা কলকাতায় এলেন তঁার পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করতে।

রাজার কলকাতায় আসা না মরা গাঙে বান আসা। যা কিছু ছিল বদ্ধ, আবিল, পঙ্কিল সবের গোড়াতেই ঘা পড়ল জোর। কুসংস্কার, বীভৎস সব সামাজিক প্রথা যুগ যুগ থেকে জাতির জীবনে এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল, যা নড়ান শক্ত, সরান কঠিন। রাজা বুঝলেন, শিক্ষার —বিজ্ঞানশুদ্ধ শিক্ষার প্রসার না করতে পারলে আর ওর মূলোচ্ছেদ করা যাবে না।

রাজার দোসরও একজন জুটে গেল। এক সাহেব। ঘড়িওলা। নাম ডেভিড হেয়ার। জাতে স্কচ। দেশীয় লোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কি করে করা যায়, সেই চিন্তাতেই সাহেবের কাজ-কারবার বন্ধ হবার দাখিল হল। নিজের ঘড়ির ব্যবসা বন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে অনন্যমনা হয়ে সাহেব শিক্ষা বিস্তারের কাজে লাগলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব তঁার সহায় হলেন। হেয়ার সাহেব দেশীয় ভাষার অনেকগুলো ইস্কুল খুললেন।

কিন্তু না। সাহেবের মন উঠল না। শিক্ষাদীক্ষার যে ছবি সাহেবের মনে আঁকা ছিল, দেশীয় ইস্কুলের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ মিল হল না। সাহেব ভাবলেন, ইংরেজী ইস্কুল না খুললে চলবে না। তঁার ঘড়ির দোকানে যে আসে, সে ইংরেজ হোক, কি বাঙ্গালী হোক, রাজপুরুষ হোক কি ব্যবসাদার হোক, তার সঙ্গে হেয়ার সাহেবের এক আলোচনা, ইংরেজী শিক্ষা কি করে প্রবর্তন করা যায়। সাহেবের সেই এক প্রস্তাব, এস, একটা ইংরেজী ইস্কুল খোলা যাক।

রাজা রামমোহনের সঙ্গে ঠিক এই সময়ে হেয়ার সাহেবের দেখা হল। আর দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রণয়, গভীর সখ্য।

রাজা তখন ধর্মসংস্কারে ব্রতী হয়েছেন। আত্মীয় সভার পত্তন হয়েছে। এই সভার এক অধিবেশনে একদিন (১৮১৬) হেয়ার সাহেবও যোগ দিয়েছিলেন। সভার শেষে ইংরেজী ইস্কুল স্থাপন করবার কথা উঠল। গণ্যমান্য অনেক লোকই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যেই ছিলেন বৈদ্যনাথ মুখুজ্জে। খুব আলাপী। খুব কাজের লোক। কলকাতায় হেন বাড়ী ছিল না, যেখানে বৈদ্যনাথবাবুর গতিবিধি না ছিল। সেদিনকার হাওয়া তিনি বুঝলেন। অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত লোকই তখন ইংরাজী ইস্কুলের প্রবর্ত্তন চাইছিলেন। বৈদ্যনাথ মুখুজ্জে পত্রপাঠ ছুটলেন তখনকার প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের বাড়ি। সব কথা তাঁকে খুলে বললেন। স্যার এডওয়ার্ড এ বিষয়ে নিজেও মাথা ঘামাচ্ছিলেন। বৈদ্যনাথের কথায় খুব উৎসাহ পেলেন।

স্যার এডওয়ার্ড রাজা রামমোহনকে ডাকলেন, হেয়ার সাহেবকে ডাকলেন। বৈদ্যনাথবাবুকে পাঠালেন গণ্যমান্য লোক-দের বাড়িতে। তাদের মত জানতে। মত আছে, সকলেরই এই বিষয়ে উৎসাহ আছে। তখন স্যার এডওয়ার্ড এক সভা ডাকলেন তাঁর বাড়িতেই। ১৮১৬ সালের ১৪ই মে এই সভা বসল। ইংরেজী ইস্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উঠতেই সকলেই পরম উৎসাহে সমর্থন করলেন। সভাতেই চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল ১১৩১৭৯ টাকার।

সঁকলের উৎসাহ যখন টগবগ করে ফুটছে, সেই সময়ে হঠাৎ বিনা মেঘে যেন বজ্রাঘাত হল। রাজা রামমোহন যেখানে আছেন, সেখানে আর আমরা নেই, বলে মাতব্বর বাঙ্গালীরা বেঁকে বসলেন। খবর রটেছিল, ইস্কুল কমিটিতে রাজাও আছেন।

কাজেই তাঁরা আর ইস্কুলের সঙ্গে সংস্রব রাখতে চাইলেন না। রাজার ধর্মমত,—তাঁর সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে তখনকার সমাজে প্রবল ঘোঁট চলেছে। সর্বনাশ! সার এডওয়ার্ড পড়লেন বিপদে। রাজাই এ প্রস্তাবের একজন প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁকে কমিটিতে না রাখলে কি চলে? অথচ রাজা কমিটিতে থাকলে অধিকাংশ লোকের সমর্থন পাওয়া যাবে না। সেটাও বড় কম ক্ষতি নয়। এখন কি করা?

রাজা নিজেই এ সঙ্কট থেকে সবাইকে উদ্ধার করলেন। নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিলেন। হেয়ার সাহেবকে জানালেন, কমিটিতে তাঁর নাম থাকা তো বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে ইস্কুলটা হওয়া।

আর তবে বাধা কিসের? না, আর বাধা কি। কুড়িজন ছাত্র নিয়ে হিন্দু কলেজ খোলা হল। সাহেবরা বললেন, ওঁরা পরোক্ষভাবে এই কলেজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করবেন। প্রত্যক্ষ-ভাবে জড়িত থাকা ওঁরা সমীচীন মনে করলেন না।

কলেজ পরিচালনার ভার পড়ল সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের উপর। দুজন গবর্ণর এবং চারজন ডিরেক্টর নিযুক্ত করা হল। বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর, আর বাবু গোপীমোহন ঠাকুর হলেন প্রথম গবর্ণর। আর প্রথম ডিরেক্টর হলেন বাবু গোপীমোহন দেব, বাবু জয়কৃষ্ণ সিংহ, বাবু রাধামাধব বাঁড়ুজ্জে আর বাবু গঙ্গনারায়ণ দাস। প্রথম সেক্রেটারী হলেন দুজন, বাবু বৈদ্যনাথ মুখুজ্জে আর লেফটেন্যাণ্ট ফ্রান্সিস আর্ভিং।

গরাণহাটার গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ি ভাড়া নিয়ে ক্লাস বসল প্রথম প্রথম। ছাত্রের সংখ্যাও দ্রুত বাড়তে লাগল। তিন মাসের

মধ্যেই ৬৯ জন ছাত্র ভর্তি হল। হিন্দু কলেজ ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। যেদিন হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়, তার পরের দিন দর্শকরা কলেজ দেখতে এসেছিলেন। সেক্রেটারী বৈদ্যনাথবাবু সেদিন তাঁদের বলেছিলেন, আজ যা দেখছেন, এতো অঙ্কুর। এমন দিন আসছে, যেদিন এই অঙ্কুর এক বিরাট বৃক্ষে পরিণত হবে।

কিন্তু তা যে এমন দ্রুতগতিতে হবে, সে আশা বৈদ্যনাথবাবুও হয়ত করতে পারেন নি। দিন যায়, ছাত্রের ভিড় বাড়ে। আর হিন্দু কলেজ বাড়ি বদলায়—১৮১৮ সালের জানুয়ারীতে ঐ পাড়াতেই আরও একটু প্রশস্ত বাড়িতে উঠে গেল। তাতেও কুলোয় না। পরের বছর তাই কলেজ গেল 'ফিরিঙ্গী কমল বোসের' বাড়িতে। তাতেও হল না। চিৎপুর থেকে কলেজ উঠে এল বৌবাজারে, তারপর বৌবাজার থেকে এখন যে বাড়িতে সংস্কৃত কলেজ আছে, সেখানে।

১৮১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হেয়ার সাহেবের উদ্যোগে স্কুল সোসাইটির পত্তন হয়। হেয়ার সাহেব সোসাইটির খরচে ২০।৩০টি ছাত্রকে হিন্দু কলেজে পাঠাতে লাগলেন। এই সব ছাত্র ছাড়া অন্য সবাইকে বেতন দিতে হত। কিন্তু সব অভিভাবকের পক্ষে বেতন দেওয়া সম্ভব হত না বলে বহু ছেলের পড়াশুনা হত না। তখন হিন্দু কলেজকে অবৈতনিক কবে দেওয়া হল। হিন্দুসাধারণের চাঁদায় কলেজের খরচ চালাবার কথা হল। কিন্তু তাতে কলেজ চলা মুশকিল হয়ে পড়ল। সেক্রেটারীদের পারিশ্রমিক বন্ধ করে দেওয়া হল। তাতেও চলে না। তখন হেয়ার সাহেব (১৮২৩ সালে) কলেজের ম্যানেজারকে সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্য চাইতে বললেন।

বড় বড় লোকরা মোটা টাকা চাঁদা দিলেন, সরকার থেকেও কিছু সাহায্য করা হল, কলেজের বেতন নেবার প্রথার আবার প্রবর্তন করা হল, তবু দুর্গতি ঘুচল না।

এইভাবে নানা দুর্যোগ-দুর্গতির মধ্য দিয়ে চলতে চলতে হিন্দু কলেজ জ্ঞানের যে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিতে লাগল তাই দেশের অসাড় আত্মায় প্রচণ্ড বিপ্লব বাধিয়ে দিল। সঙ্ঘর্ষ বাধল আলো আর অন্ধকারে, জ্ঞান ও অজ্ঞানে, জড়তা ও প্রগতিতে, নতুনে আর পুরাতনে।

ফরাসী বিপ্লবের আলো তখন এদেশের চিন্তায় এসে উঁকি মারছে। প্রাণে প্রাণে চাঞ্চল্য জাগছে। চিন্তায় কর্মে নতুন প্রাণের ছোঁয়া লেগেছে। এই প্রাণের ছোঁয়া লাগাবার আধার হল হিন্দু কলেজ। হোতা হলেন হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও। এক ফিরিঙ্গী। হিন্দু কলেজের এক নবীন অধ্যাপক। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে রেনেশাঁস হয়েছিল, যার প্রভাব সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল, আজকের ভাবত যে তপস্যার ফল, তার অন্যতম জনক ডিরোজিও। ডিরোজিও 'ইয়ং বেঙ্গল' সৃষ্টি করলেন। এই ইয়ং বেঙ্গল নতুন বাঙ্গালী জাতের সৃষ্টি করল।

এদিকে নিজের আয়ে চলা হিন্দু কলেজের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। সরকারী সাহায্যের জন্য আবার আবেদন-নিবেদন শুরু হল। সরকার তখনও মনস্থির করে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে অগ্রসর হতে সাহস করেন নি। সংস্কৃত শিক্ষা আর মাদ্রাসার পিছনেই তাঁরা অর্থব্যয় করেছিলেন। তখন গভর্ণর জেনারেল ছিলেন লর্ড আমহার্স্ট। রাজা রামমোহন ১৮২৩ সালে সরকারের কাছে এক কড়া চিঠি লিখলেন। তিনি যেন গর্জন করে উঠলেন,

“যদি ইংরেজ জাতিকে প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ রাখা উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে প্রাচীন স্কুলমেনদিগের অসার বিদ্যার পরিবর্তে বেকনের প্রবর্তিত জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত হইতে না দিলেই হইত, কারণ প্রাচীন জ্ঞানই অজ্ঞতাকে বহাল রাখিত। সেইরূপ এদেশীয়দিগকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখাই যদি সরকারের আকাঙ্ক্ষা ও নীতি হয়, তাহা হইলে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় উৎকৃষ্টতর উপায় আর নাই। তৎপরিবর্তে এদেশীয়দিগের উন্নতি বিধান যখন সরকারের লক্ষ্য, তখন শিক্ষা বিষয়ের উন্নত উদার নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক, যদ্দারা অপরাপর বিষয়ের সহিত গণিত, জড় ও জীব বিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, শারীরস্থানবিদ্যা ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যে অর্থ এখন প্রস্তাবিত কার্যে ব্যয় করিবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে, তদ্দারা ইউরোপে শিক্ষিত কতিপয় প্রভাবশালী ও জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে, ইংরেজী শিক্ষার জন্য একটি কলেজ স্থাপন করিলে, তৎসঙ্গে গ্রন্থাগার, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রাদি ও প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল দিলেই পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।”

এই প্রার্থনা অবশ্য সেদিন পূর্ণ হয়নি। তবে কিছু কাজ হল। ঠিক হল, সংস্কৃত কলেজের জন্য যে বাড়ি তৈরী করা হবে, তার সঙ্গেই হিন্দু কলেজের বাড়িও উঠবে।

আরও কিছুদিন গেল। ১৮৫১ সালে কাউন্সিল অব এড়ুকেশনের সেক্রেটারী ডা. মোয়াট সরকারী নির্দেশে শিক্ষা সম্পর্কে এক তদন্ত করলেন। তদন্তের রিপোর্টে তিনি এমন একটা কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিলেন, যাতে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলেরই প্রবেশাধিকার থাকবে। হিন্দু কলেজের তখন-

কার নিয়ম অনুসারে হিন্দু ছাড়া ওখানে আর কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। ডাঃ মোয়ট হিন্দু কলেজকেই একটা সর্বজাতিক কলেজে রূপান্তরিত করবার প্রস্তাব করলেন। হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটি আর সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর ডাঃ মোয়টের প্রস্তাবমত কাজ করাই স্থির হল। বাবু রসময় দত্ত ছিলেন সে সময়ে হিন্দু কলেজের সেক্রেটারী। তাঁরই উৎসাহে ও উদ্যোগে কাজটা সহজে সমাধা হল।

হিন্দু কলেজের দুটো বিভাগ ছিল। জুনিয়র আর সিনিয়র। সিনিয়র বিভাগকে আলাদা একটি সর্বজাতিক কলেজে রূপান্তরিত করা হল। নাম হল "দি প্রেসিডেন্সী কলেজ।" যদিও আনুষ্ঠানিক-ভাবে ১৮৫৫ সালের ১৫ই জুন এই কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একবছর আগেই এই নতুন কলেজ ৬৫ জন হিন্দু আর ২ জন মুসলমান ছাত্র নিয়ে ক্লাস আরম্ভ করেছিলেন। সিনিয়র বিভাগটিকে প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত করার পর জুনিয়র বিভাগটিকে হিন্দু স্কুলে রূপান্তরিত করা হল

এর দু বছর পরে, ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হল। আর ঐ বছর মার্চ মাসেই প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষার প্রচলন হল। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ২৩ জন ছাত্র ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র আর দ্বিতীয় ভারতীয় প্রধান বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষও সেই দলে ছিলেন। পরের বছর বি. এ. পরীক্ষার প্রবর্তন হল। সেবারও বঙ্কিমচন্দ্র সেই পরীক্ষায় পাশ করে প্রথম গ্র্যাজুয়েট হবার সম্মান লাভ করলেন। আরও একজন সেবারে তাঁর সঙ্গে গ্রাজুয়েট হয়েছিলেন। তাঁর নাম যদুনাথ বসু।

তারপর থেকে একটানা একশ বছরের প্রেসিডেন্সী কলেজের যে ইতিহাস, তা শুধু কৃতিত্বের, শুধু সাফল্যের। বাংলার, ভারতের, পাকিস্থানের বহু কৃতী সন্তান এই কলেজের ছাত্র। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই কলেজেরই ছাত্র। প্রেসিডেন্সী কলেজ তার কৃতিত্বের গৌরব করতে পারে।

*আজ থেকে ১৩৮ বছর আগে, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরদিন, ১৮১৭ সালের ২১শে জানুয়ারী বাবু বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় যে কথা বলেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। "আজ যা দেখছেন, এ তো অঙ্কুর। এমন দিন আসছে, যেদিন এই অঙ্কুর এক বিরাট বৃক্ষে পরিণত হবে।" সফল হয়েছে তাঁর আশা। সেদিনের সেই হিন্দু কলেজ থেকে আজকের প্রেসিডেন্সী কলেজ, অঙ্কুর থেকে মহীরুহই বটে।

---

* ১৯৫৫ সালের ১৫ই জুন, প্রেসিডেন্সী কলেজের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রচিত।

সেই রাত্রে, এভারেস্ট বিজয়ের আগের রাত্রিটাতে (২৮শে মে ১৯৫৩), ওদের দুজনের ভালো ঘুম হয়নি। তেনজিং ঘুমতে চেষ্টা করছিলেন বার বার। কিন্তু ভয়ানক অস্বস্তি, দারুণ অস্থিরতা। ওঁর সমস্ত দেহটা কে যেন প্রাণপণে চিবুচ্ছিল। কখনো কখনো মনে হচ্ছিল, বিরাট বলশালী একজন কেউ তাঁর বুকে জাঁতা দিয়ে বসেছে কঠিন থাবা দিয়ে তাঁর গলা চেপে ধরেছে, এই বুঝি দম বন্ধ হ'য়ে এল। এখন আর কোনও কিছুর নয়, দরকার শুধু অক্সিজেনের। কিন্তু সঙ্গে যে অক্সিজেন আছে তা খুবই পরিমিত। এখনই তা থেকে খরচ করতে দ্বিধা তাঁদের হলো।

হিলারী স্টোভ জ্বাললেন কফি বানালেন। গরম কফি পেটে পড়তে শরীর কিছুটা চাঙ্গা হলো। তারপরে 'স্যুপ' তৈরী হলো, মাছ রান্না হলো, বিস্কুট চকোলেট সহযোগে সেই রাত্রের খাওয়াটা মন্দ জমল না। তবু অস্বস্তি কাটল না। তখন তেনজিং আর হিলারী পরামর্শ করলেন, আর কৃপণতা ক'রে কি হবে, অক্সিজেন খানিকটা ক'রে নেওয়া যাক। ওরা তারপর প্রায় দুঘণ্টা অক্সিজেন নিলেন। সুফল ফলল। ক্লান্তির দরুণ যে অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তা দূর হলো। রাত্রি দুটো পর্যন্ত মোটামুটি নিরুদ্বেগেই ঘুম দিলেন। তারপর আর ঘুমতে পারেন নি। আবার সেই নিদারুণ অস্বস্তি, তেমনি অস্থিরতা।

আমরা যারা সমতলবাসী, কেউ কল্পনা করতে পারব না, ২৮০০০

ফুটের ওপরে উঠবার পর কেমন অবস্থা হ'তে পারে লোকের। দুর্দান্ত হাড়কাটা ঠাণ্ডার কথা ছেড়েই দিলাম। সেখানে বাতাস খুব পাতলা, খুব হাল্কা। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণও খুব কম। এত কম যে কলকাতার কোনও লোককে যদি এক হ্যাঁচকা টানে সেখানে নিয়ে ফেলা যায় তো তৎক্ষণাৎ সে দম আটকে ম'রে যাবে। তার উপর বায়ুমণ্ডলের চাপও খুব ক্ষীণ। বাতাস যত পাতলা হয় দেহের ওজনও তত বেড়ে যায়। সেখানে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো নাড়াচাড়া করা ভয়ানক কষ্টসাধ্য। পা তো আর পা নয় যেন পাথরের থাম। হাত দুখানা যেন সীসে দিয়ে তৈরী। হাতের দস্তানা খুলতে যাওয়া দূরে থাক, ঘড়িটার দিকে চেয়ে যে সময় দেখবে, তাতেই প্রাণান্ত। বরফ কাটার হাল্কা কুড়ুলটা তুলতে বুক ফেটে যায় আর কি।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের সেটা শেষ পর্ব। তাই প্রকৃতির যত শক্তি-সামর্থ্য, যত কৌশল আছে, সব জড়ো করেছে সেখানে। সব নিয়ে বাধা দিতে দাঁড়িয়েছে মানুষের দুর্বার গতিকে, খর্ব করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে মানুষের দুর্জয় শক্তিকে। সে যে কী ভীষণ সংগ্রাম কেউ কল্পনা করতে পারে না।

অস্বস্তি শুধু যে দেহে তা নয়, মনেও সেখানে উদ্বেগ দেখা দেয়। চিন্তাশক্তি নির্জীব হ'য়ে পড়ে। অসাড় হ'য়ে আসে বুদ্ধি। একটানা অনেকক্ষণ কোনো কিছু ভাবা যায় না, টুকরো-টুকরো ছাড়া-ছাড়া ঘটনা মনে আসে, আবার মুছে যায়। তেনজিং মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ছিলেন। একই তাঁবুর মধ্যে তিনি আর হিলারী। হিলারী পাশে শুয়ে আছেন। এই প্রথম ওঁরা এক তাঁবুর মধ্যে আশ্রয় নিলেন। এতদিন পর্যন্ত তেনজিং-এর তাঁবু সাহেবদের থেকে

আলাদা ছিল। এই নয় নম্বর শিবিরে তাঁরা একই তাঁবুর মধ্যে রাত কাটালেন। এই ব্রিটিশ সাহেবদের ব্যবহার তেনজিং-এর কাছে বড় অদ্ভুদ লাগে। এরা বড় বেশী কেতাদুরস্ত। তেনজিং-এর মনে পড়ল গতবারের সুইস্ দলের সঙ্গে অভিযানের কথা। তারা তাঁকে কত আপন ক'রে নিয়েছিল। সুইস্ সাহেবরা তাঁর সঙ্গে আলাদা কোনো ব্যবহার করেনি। বিশেষ ক'রে এই নয় নম্বর শিবিরটায় শুয়ে তাঁর মনে পড়ছিল ল্যাম্বেয়ারকে। গতবার ল্যাম্বেয়ারের সঙ্গে এসে এইখানেই তাঁরা তাঁবু গেড়েছিলেন! তখনই তিনি ভেবে রেখেছিলেন, বারান্তরে যদি আসি, এইখানেই শিবির তুলব। জায়গাটা ২৭০০০ ফুট উঁচুতে।

তেনজিং শেষ পর্যন্ত আবার এলেন এখানে। তবে এবারে সঙ্গে সেই অকৃত্রিম বন্ধু ল্যাম্বেয়ার নেই, আছেন নতুন এক অভিযাত্রী, হিলারী। বেচারা ল্যাম্বেয়ার! আগের বছর মাত্র ৭০০ ফুটের জন্য মার খেয়ে গেল!

তেনজিং ঘুমের আশা ছেড়ে দিলেন। ঘড়ি দেখলেন। রাত প্রায় সাড়ে তিনটে। স্টোভ জ্বালিয়ে বরফ গলাতে শুরু করলেন। বরফ ফুটিয়ে জল তৈরি হলো। সেই জল দিয়ে তৈরি হলো লেমন জুস। তিনি আর হিলারী এক কাপ এক কাপ লেমন জুস্ খেলেন। তারপর আরো খানিকটা বরফ গলিয়ে গরম জল বোতলে ভরে নিলেন। পাহাড়ে চড়বার সময় তেষ্টা পাবে যখন, তখন কাজে লাগবে।

তেনজিং আর হিলারী দুজনেই শুয়েছিলেন দুটো বড় ব্যাগের মধ্যে। 'ঘুমবার ব্যাগ'গুলো বিশেষভাবে তৈরি। হাজার ঠাণ্ডাতেও সে ব্যাগে হিম লাগে না। ব্যাগের মধ্যে শুয়ে শুয়েই তেনজিং

কাজগুলো সেরে রাখলেন। যাত্রার সময় যেন আর ওসবের জন্য দেরি না হয়।

তেনজিং-এর অভিজ্ঞতা বেশী। তিনি জুতো জামা পরেই ঘুমবার ব্যাগের মধ্যে ঢুকেছিলেন। হিলারী তা করেন নি। তিনি জুতো জোড়া খুলে রেখে শুয়েছিলেন।

তেনজিং উঠে পড়লেন। কফি আর লেমনজুস্ তৈরি করে খেলেন, হিলারীকেও দিলেন। তারপর হিলারীকে বললেন, "এবার তাহলে এগুনো যাক।"

হিলারী বললেন, "বেশ। চল যাই।"

হিলারীও উঠে পড়লেন। জুতো পরতে গিয়ে দেখেন, ঠাণ্ডায় জমে তা পাথরের মত শক্ত হ'য়ে গেছে। সর্বনাশ! হিলারীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সঙ্গে আর তো জুতোও নেই।

হিলারী বললেন, "এখন উপায়?"

তেনজিং বললেন, "দেখা যাক। গরম করলে যদি কোনও ফল হয়।"

তেনজিং আবার স্টোভ জ্বালালেন। তারপর হিলারীর বুট জোড়া গরম করতে লাগলেন।

তেনজিং যতক্ষণ হিলারীর বুট গরম করবেন, আসুন, আমরা ততক্ষণে আগের কথাগুলো সেরে ফেলি।

* * *

গতবারে সুইসদের সঙ্গে যে অভিযানে তেনজিং গিয়েছিলেন, তার ধকল সামলাতে তিনি পারলেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর ভেঙে পড়ল। তার উপর নভেম্বর মাসে (১৯৫২) কাঠমাণ্ডুতে তাঁকে ম্যালেরিয়ায় ধরল। ডিসেম্বরেও সে জ্বর ছাড়ল না। পাটনার

এক হাসপাতালে দশ দিন তিনি পড়ে থাকলেন। তারপর ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে তেনজিং দারজিলিঙে ফিরে এলেন। তাঁর ওজন তখন ষোল পাউণ্ড কমে গেছে।

একে অসুখ তার উপরে অর্থের অভাব। নিদারুণ অভাব। মেয়ে দুটোর ইস্কুলের মাইনে বাকি পড়ে গেল। গতবারের অভিযানে সুইসরা যে টাকা দিয়েছিল, তা কবে নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। আছে শুধু তাঁদের দেওয়া পোষাকগুলো, পাহাড়ে উঠবার বুট জোড়া, ঘুমবার ব্যাগ আর তাঁবুটা। ছোট ঘরের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে সব চিহ্নগুলো এখানে ওখানে পড়ে আছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুর্বল তেনজিং সেগুলোর ওপর চোখ বোলান, ক্লান্তি এলে চোখ বোজেন। শুধু যত্ন করে রেখে দিয়েছেন নেপালের মহারানার দেওয়া পদকটা। 'নেপাল প্রতাপ বর্ধক' পদকটা তাঁর গলায় নিজের হাতে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন মহারাজা ত্রিভূবন। সেবার পরাজিত হয়ে ফিরলেও কাঠমাণ্ডু তাঁকে বিজয়ের অভ্যর্থনাই জানিয়েছিল। এ পর্যন্ত তেনজিংই সকলের চাইতে উঁচুতে উঠেছেন। অবশ্য এভারেস্টে উঠতে পারেন নি। সাতশ ফুট বাকি থাকতেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবুও এখনও পর্যন্ত সব চাইতে উঁচুতে ওঠার রেকর্ড তেনজিংএরই। তারই সম্মানার্থে মেডেলটা দেওয়া। এক একবার মেডেলটা দেখেন আর উৎসাহ পান।

অর্থাভাবের তাড়নায় অস্থির হয়ে তেনজিং ভাবলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে কিছু টাকা ধার চাইবেন। সেই টাকায় মেয়েদের ইস্কুলের বেতনটা দিয়ে দেওয়া যাবে।

অসুস্থতা আর অভাবের আক্রমণে তেনজিং যখন বিপর্যস্ত হয়ে

পড়েছেন, হতাশ হয়ে পড়েছেন, এমন সময় সুইজারল্যাণ্ড থেকে একখানি চিঠি পেলেন। লিখেছেন রেমণ্ড ল্যাম্বেয়ার।

তিনি লিখেছেন, "বন্ধু, পর্বতারোহণ সম্পর্কে যারা কিছু সংবাদও জানে, তাদের কাছেও তোমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। যদি আসো, দেখবে, ইওরোপ তোমায় কিভাবে সম্বর্ধনা জানাবে।"

আর প্রায় সেই সঙ্গেই লণ্ডন থেকে দারজিলিঙের হিমালয়ান ক্লাবের সম্পাদিকার কাছে এক চিঠি এল। তেনজিং-এর খবর কি? আগামী মার্চে যে ব্রিটিশ অভিযাত্রী বাহিনী এভারেস্ট অভিযানে নেপালে যাবে, তেনজিংকে কি তাদের সঙ্গে পাওয়া যাবে?

দারজিলিঙের হিমালয়ান ক্লাবের সম্পাদিকা মিসেস হেণ্ডারসন প্রস্তাবটা তেনজিংকে জানালেন। ইতিমধ্যে সুইস ফরাসী আর জাপানীদের কাছ থেকেও প্রস্তাব এসে গেছে। তেনজিং ভাবতে লাগলেন, কাদের সঙ্গে যাওয়া যেতে পারে? কিন্তু মিসেস হেণ্ডারসন তেনজিং-এর সব চিন্তার অবসান ঘটিয়ে দিলেন। পরামর্শ দিলেন, ব্রিটিশ দলটার সঙ্গে যেতে। বললেন, এদের সঙ্গে গেলেই তাঁর ভাল হবে। তেনজিং রাজী হলেন।

ব্রিটিশরা তাঁকে মাসে ৩০০ টাকা করে দিতে রাজী হলো। কিন্তু তেনজিং সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। টাকার জন্য নয়, ব্রিটিশরা তাঁকে ব্রিটিশ আলপাইন ক্লাবের সদস্য করতে রাজী হলেন না। অথচ সুইস্‌রা তাঁকে বিনাবাক্যে সুইস্ আলপাইন ক্লাবের সদস্য-পদের মর্যাদা দিয়েছিলেন।

যা হোক, তেনজিং দারজিলিঙ থেকে খুব উচুতে উঠতে অভ্যস্ত কুড়িজন শেরপা নিয়ে রওনা হলেন, রক্সৌল পর্যন্ত ট্রেনে, তারপরে

ভীমপেডি থেকে হাঁটা পথে কাঠমাণ্ডু। ৪ঠা মার্চ (১৯৫৩) তাঁর সঙ্গে কর্ণেল হাণ্টের কাঠমাণ্ডুতে সাক্ষাৎ হলো।

কর্ণেল এইচ সি জন হাণ্ট এবারকার ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলটির নেতা। বয়েস বিয়াল্লিশ বছর। বাড়ি ওয়েলসে। একেবারে হুঁদে 'মিলিটারী ম্যান'। ব্রিটেনের স্যাণ্ডহার্স্ট সামরিক বিদ্যালয়ের পাশ করা ছাত্র। গত যুদ্ধে চতুর্থ ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে গ্রীস, ইতালী আর মিশরে বাহিনী পরিচালনা করেছেন। ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারীর অধীনে এল আলেমিনের বিখ্যাত মরুযুদ্ধে জার্মান সেনাপতি রোমেলের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছিলেন। রোমেল তখন অজেয়। তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সেদিন যারা তাঁকে পরাস্ত করেছিলেন, কর্ণেল হাণ্ট তাঁদের একজন। অজেয় এভারেস্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবার জন্য তাই কি এবারে তাঁকেই অধিনায়ক করা হলো?

কর্ণেল হাণ্ট ছাড়া আরও বারজন সাহেব এবারের অভিযানে যোগ দিয়েছেন। তাঁর মধ্যে মেজর সি জি উইলিও স্যাণ্ডহার্স্টের ছাত্র। বয়েস তেত্রিশ। এবারকার এভারেস্ট অভিযানের সংগঠনের ভার ওঁর। ডব্লিউ নয়েসের বয়েস পঁয়ত্রিশ, তিনি ইস্কুলের মাষ্টার আবার লেখকও। এর আগে গাড়োয়াল এবং সিকিমে কয়েকবার অভিযান চালিয়ে গেছেন। ২৩৩৮৫ ফুট উঁচু এক চূড়ায় তিনি উঠেছেন। টি ডি বুর্দিলোঁ একজন বৈজ্ঞানিক। পদার্থবিদ। তাঁর বয়েস উনত্রিশ। ১৯৫১ সালে আর ১৯৫২ সালে দুবার এসেছিলেন হিমালয় অভিযানে। এ গ্রেগরীর বয়েস চল্লিশ। জি সি ব্যাণ্ড হচ্ছেন ভূতাত্ত্বিক, তাঁর বয়েস চব্বিশ। আর সি ইভান্স একজন চিকিৎসক, বয়েস চৌত্রিশ। জি লোয়ের বাড়ি নিউজি-

ল্যাণ্ড। তাঁর বয়েস আঠাশ। তিনিও একজন শিক্ষক। এম ওয়েস্টম্যাককের বয়েস আঠাশ। ডাঃ এম ওয়ার্ডের বয়েস আঠাশ, ইনি দলের মেডিক্যাল অফিসার। ডাঃ এল জি সি পাগর বয়েস তেতাল্লিশ, ইনি শরীরতত্ত্ববিদ। টি স্টবার্টের বয়েস পঁয়ত্রিশ, ইনি ফটোগ্রাফার।

এই দলে আরো একজন আছেন, নাম এডমণ্ড হিলারী, তাঁর বাড়ি নিউজিল্যাণ্ড, বয়সে চৌত্রিশ। লম্বা হিলহিলে চেহারা। একটু লাজুক। দেশে তাঁর মধুর চায আছে।

আর আছেন তেনজিং নোরকে, বয়েস তাঁর উনচল্লিশ। তেনজিং-এর শেরপা দলের মধ্যে সব চাইতে বয়েস বেশী দাবা থোন্দাপের, আর সব চাইতে কম তোপগায়ের, মাত্র সতের। এরা দুজন ছাড়া পাসাং দাবা, আঙ্ নাঙ্গিল, আঙ্ শেরিং, আঙ্ তেম্বার, পেম্বার আঙ্ নিমাও এবারে তেনজিং-এর সঙ্গে ছিলেন। এরা প্রত্যেকেই 'টাইগার'—বাঘ।

কর্নেল হাণ্টের দলে বাছা বাছা লোকই শুধু নেই, সরঞ্জামও যা আছে তাও অন্যান্য সব বারের চাইতে উৎকৃষ্টতর। অক্সিজেনের যন্ত্রপাতির দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে এবার। বিশেষ-ভাবে তৈরি ক'রে আনা হয়েছে খাবার, পোষাক, তাঁবু প্রভৃতি। বিটেনের বিজ্ঞ বিজ্ঞানী আর দক্ষ কারিগরেরা সে সব জিনিস তৈরী ক'রে দিয়েছেন। সরঞ্জাম আর যন্ত্রপাতির দিক দিয়ে কর্নেল হাণ্টের দলের মতো আর কোনও দল এত ভালভাবে সজ্জিত ছিল না। গতবারের সুইস্ দলটাও নয়।

তবুও এত জিনিস সত্ত্বেও কোথায় যেন একটা কিসের অভাব থেকে গেল। আর সে অভাব ধরা পড়ল শেরপাদের কাছে। কর্নেল

হাণ্টের ব্যবহার সবটাই কেতাদুরস্ত, আন্তরিকতার অভাব বড় বেশী। আর একটা ব্যাপারে শেরপারা অসন্তুষ্ট হ'য়ে উঠল। সাহেবদের সঙ্গে তাদের পার্থক্যটা যেন চোখে আঙুল দিয়ে কর্নেল হাণ্ট দেখিয়ে দিতে লাগলেন।

কাঠমাণ্ডুতে শেরপাদের খাওয়া-থাকার যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাতে তারা খুশী হ'তে পারেনি। কেউ কেউ বলেই ফেলল, "আমাদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করছে না এরা।"

তেনজিংকেও অন্যান্য শেরপাদের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হলো তাও কোথায়? বৃটিশ কন্‌স্যুলেটের একটা মোটরের গ্যারেজে। আগে ছিল সেটা আস্তাবল। হাত মুখ ধোবার জায়গা নেই তাতে পায়খানা নেই। শেরপারা খুব চটে গেল। গোলমাল শুরু করল তারা।

গোলমাল দেখে তেনজিং এসে শেরপাদের বোঝালেন, একটা দিন কোনও মতে কাটিয়ে দাও। কাল ভাটগাঁতে গিয়ে অন্য বন্দোবস্ত করা যাবে।

ভাটগাঁ কাঠমাণ্ডু থেকে আট মাইল দূরে। সেখান থেকেই এবারে নামচেবাজার যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নামচেবাজার যাবার পথ চারটে। একটা দার্জিলিঙ থেকে। সেই পথ এমনই দুর্গম যে শেরপা ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না। তবু এত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, সে পথ অতিক্রম করার সময় সাবধানী শেরপারা এখানে ওখানে পরিত্যক্ত অনেক চিহ্ন দেখেছে; হয়ত একটা মাথার টুপি, কি একপাটি জুতো, কি একটা শার্ট। কার? কে জানে? কোন্ অতর্কিতে বরফের বিরাট এক চাঙড় কোন্ হতভাগ্যের ঘাড়ে ভেঙে পড়বে, আগের মুহূর্তেও কেউ বলতে পারে না। হয়ত

বহুদিন পরে এইসব চিহ্ন কেউ কুড়িয়ে নিয়ে আসবে, শেরপা পল্লীতে সেদিন তুমুল উত্তেজনা দেখা দেবে। রান্নাঘরের কাজ ফেলে শেরপানীরা ছুটে আসবে। পুরুষরা আসবে জ'মে আসা জয়াকে ফ্যালা-ছড়া করবে। তারপর কোনো শেরপানী হয়ত বুকভাঙা কান্নায় মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, তার নিখোঁজ স্বামীর চিহ্নে মুখ গুঁজে। প্রায় ভাবলেশহীন মুখখানা এগিয়ে আনবে কোনো ক্ষীণদৃষ্টি অশীতিপর বৃদ্ধ। ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে সমর্থন জানাবে, হ্যাঁ, এটা তারই ছেলের, তার একমাত্র ছেলের। কম্পমান আলো তাদের সকলের বিমূঢ় মুখগুলোকে দেওয়ালের উপর আছড়ে ফেলতে থাকবে। দীর্ঘশ্বাস পাহাড়ের বাতাসের সঙ্গে ঘুরপাক খেতে খেতে উঠে শূন্যে মিলিয়ে যাবে। তারপর

তারপর কিন্তু আরও পার হবে না। ক্ষুধার কামড়ে অস্থির হ'য়ে বোঝা পিঠে নিয়ে সেই দুর্গম পথেই আবার পা বাড়াবে কোনো শেরপা তরুণ।

ভারত সীমান্ত দিয়ে নামচেবাজার যাবার এ ছাড়া আরো দুটি পথ আছে। জয়নগর থেকে একটা আর যোগবানী থেকে আরেকটা এই দুটো পথই দক্ষিণ থেকে উত্তরে গিয়েছে। জয়নগরের পথে ঘুরতে হয় অনেক বেশী। যোগবানী থেকে বরং দূরত্ব কম। লোকে বলে বানের দিনের পথ, কিন্তু ১৯৫১ সালে মি এরিক শিপটন লোকের কথায় নির্ভর ক'রে রীতিমত নাকানি চোবানি খেয়েছেন। তিনি এই পথেই চলেছিলেন তার অভিযাত্রী দল নিয়ে। দুদিন না যেতেই নামল প্রচণ্ড বর্ষা। পথঘাট মুছে গেল, সাঁকো ভেসে গেল। ভারবাহকরা কেউ কেউ দিলে পিঠটান। ভদ্রলোকের একেবারে যেন দশদশা। প্রায় একমাস লাগল তার নামচেবাজার পৌঁছতে।

তাই এবার কাঠমাণ্ডুর পথে যাওয়া। গত বছরের অভিযাত্রীরাও এই পথ অনুসরণ করেছিলেন।

এই পথের আরো একটা মস্ত সুবিধা, প্রচুর ভারবাহক মেলে।

কাঠমাণ্ডু থেকে নামচেবাজারের দূরত্ব ১৭০ মাইল। অভিযাত্রীরা দুটি দলে ভাগ হ'য়ে গেলেন। প্রথম দলটি তৈরি হলো নয়জন সাহেব, ১৮ জন শেরপা আর ১৬২ জন ভারবাহক নিয়ে। এদের সঙ্গে মালপত্র থাকল প্রায় ৯০০ পাউণ্ড ওজনের। আরেকটি দলে থাকলেন কর্নেল হাণ্ট স্বয়ং, তিনজন সাহেব, ২০০ জন ভারবাহক আর দুজন শেরপা। এরা মাল সঙ্গে নিলেন প্রায় ৮০০ পাউণ্ড।

নানা ধরনের মালপত্র এবার এঁদের সঙ্গে আছে। খাবার থেকে শুরু ক'রে অক্সিজেন, ওষুধ থেকে শুরু ক'রে বরফ স্তূপের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হাঁটবার উপযোগী জুতো, তাঁবু আর ফিলিম তোলার ক্যামেরা, অ্যালুমিনিয়মের মই আর কেরোসিন স্টোভ, কিছু আর বাকি নেই। নানা বারের বিফলতা থেকে শিক্ষা পেয়েছেন অভি-যাত্রীরা। বিজ্ঞানের চরম সুযোগ নিয়ে তৈরি করিয়েছেন উপযোগী সরঞ্জাম। সেই বিরাট সম্ভার বাহিত হবে পাহাড়ী মানুষের পিঠে পিঠে। যাবে ভাটগাঁ থেকে নামচেবাজার। নামচেবাজার থেকে উঠবে থায়াংবক মঠে। সেখান থেকে উঠবে আরো উপরে আরো উপরে—আরো উপরে। লক্ষ্য এভারেস্ট শিখর।

কাঠমাণ্ডু থেকেই শেরপাদের সঙ্গে সাহেবদের খিটিমিটি শুরু হয়েছিল, ভাটগাঁয় এসে তাতো মিটলই না, আরো বরং বেড়ে গেল। ভাটগাঁতে শেরপাদের একটা ক'রে ঘুমবার ব্যাগ দিয়ে দেওয়া হ'ল। আর কিছু না। অথচ সুইস্‌রা গতবার এখান থেকেই তাদের জুতোও দিয়েছিল। সেকথা কর্নেল হাণ্টকে বলা হলো।

কর্নেল হাণ্ট সাফ জবাব দিলেন, 'অন্যে কি করেছে না করেছে তা আমার দেখবার কথা নয়। আমি আমার মত চলব। নামচে-বাজার না গেলে কেউ জুতো পাবে না।'

জবাব শুনে শেরপারা গজগজ করতে লাগল।

বলল, 'এই রকম ব্যবস্থা হবে জানলে আমারা আসতামই না।'

তেনজিং তাদের বোঝালেন, "এখন যখন রওনা হ'য়ে পড়েছি, তখন আর গোলমাল ক'রে কাজ নেই। নামচেবাজার পৌঁছলে বন্দোবস্ত একটু উন্নত হবে।"

তেনজিং-এর কথায় সবাই প্রবোধ মানল। তারপর শুরু হলো যাত্রা। প্রথম দলটি রওনা দিলেন ১০ই মার্চ, দ্বিতীয়টি তার পরের দিন।

বিরাট সম্ভার ব'য়ে নিয়ে মানুষের বিরাট বহর চলেছে। এঁকে বেঁকে, উঠতে উঠতে, নামতে নামতে। পথের যেমন শেষ নেই, তেমনি এই যাত্রারও যেন ছেদ নেই।

সে কী পথ! পাকদণ্ডি। কোথাও কোথাও মাত্র একটি পা-ই রাখা যায় এমন অপ্রশস্ত। নেপালের ভরাই। মার্চের কি প্রচণ্ড দাবদাহ। যেন পৃথিবী পুড়ছে। সেই ঝলসানো গরমে এক একটি চড়াই উঠতে এক যুগের আয়ু খরচ হ'য়ে যায়। বেশীক্ষণ বিশ্রাম নেবার উপায় নেই। সময় অপচয় করলে চলবে না। মাপা মুহূর্ত হাতে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারলে সকল পরিশ্রম, এত অর্থব্যয়, সব ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

এভারেস্ট জয় করতে কি লাগে?

মানুষের উদ্যম, বিজ্ঞানের সাহায্য, আর? আর আবহাওয়ার প্রসন্ন দৃষ্টি। প্রথম দুটিকে মানুষ আয়ত্তে এনেছে। কিন্তু

আবহাওয়ার মর্জি দেবা ন জানন্তি। এটা শুধু জানা, মে-এর শেষ সপ্তাহ থেকে জুনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সময়টুকুই স্বর্ণক্ষণ। এই পনের দিনের মধ্যে যদি কাজ সমাধা হলো তো হলো। নইলে এভারেস্ট ওঠার আর আশা নেই।

মার্চের প্রথম দিকেও বরফ গলা শেষ হ'য়ে ওঠে না। আবার জুন আসতে না আসতেই মৌসুমী প্রবল ধারা ঢালতে শুরু ক'রে দেয়। কর্নেল হাণ্ট এবারে আলিপুর হাওয়া অফিসের সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে গেছেন নিয়মিতভাবে আবহাওয়ার খবর পাঠাবার।

তাই সময় বাঁচাও। যত ত্বরা পার চল।

এবারে এখনো বর্ষা শুরু হয়নি। আকাশ পরিষ্কার। প্রকৃতি প্রসন্ন। পথের ধারে কখনো কখনো অর্কিডের বেগুনী মুখ কি সোনালী র‍্যাস্প্‌বেরী হঠাৎ দেখা দেয়। কোথাও রডোডেনড্রনের অজস্র সমারোহ। কোথাও গাঢ় লাল, কোথাও মাখন-সাদা, কোথাও ফিরোজা, কোথাও বেগুনী, কোথাও বা হলদে। একখানা বাহারী কার্পেটের উপর কত রঙের যে ঢালা পোড়েন!

পথ কখনো কখনো গোঁ ধ'রে উঠে গেছে খাড়া। এমনই খাড়াই যে সারাদিন ধরে অভিযাত্রীরা উঠছে তো উঠছেই। হাঁফ ধ'রে ওঠে বুকে। শিরদাঁড়া টনটন করে। অন্তরাত্মা ছটফট করে একটুখানি বিশ্রামের জন্য।

ধারে ধারে নগাধিরাজ। সহস্রশীর্ষ, সমুন্নত। চোখের সীমানায় বন্দী। কিন্তু হাত বাড়াও নাগাল পাবে না। পাবে, তবে সহজে নয়। কৃতিত্বের মূল্য ভিন্ন তাকে আয়ত্তে আনবে কি দিয়ে?

পার্বত্য নদী ছুটে চলেছে চপলা মেয়ের মত পাথর থেকে পাথরে ঝাঁপ দিতে দিতে। দূরে দূরে কলকল খলখল কলোচ্ছ্বাসে ছুটেছে।

ক্বচিৎ বিপরীত দিক থেকে কোনো পর্বতবাসীর দল এসে পড়ছে, পাশ কাটিয়ে চ'লে যাচ্ছে নীরবে। কারো বোঝায় চাল, মশলা। কারো বোঝায় বা হাঁস মুরগী। পিঠে-বোঝা মানুষগুলি আসছে হয়ত নামচেবাজার থেকেই। হয়ত বা আরো দূর, তিব্বতের কোনো অংশ থেকে।

অভিযাত্রীদের অনেকটা সুবিধে হয়েছে বর্ষা বৃষ্টি না নামাতে। পার্বত্য নদীতে জল কম, ঝর্ণাগুলো প্রায় শুকনো। নদীখাতের পাথরগুলো সিঁড়ি প্রায় বানিয়েই রেখেছে। পা দিয়ে ধাপে ধাপে উঠে গেলেই হলো। তবে ফিরতি পথে বর্ষা নামবেই। পথ হবে পিচ্ছিল। তখন হবে সমস্যা।

আরো এক সর্বনাশা উৎপাত তখন দেখা দেবে। জোঁক। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি রক্তচোষা লুকিয়ে থাকবে ঘাসের ডগায়, আগাছার পাতায়, গাছের ডালে। লোক পেলেই লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে, মাথায়। জড়িয়ে ধরবে পায়ে।

ঘোর বর্ষার পিচ্ছিল পথের সঙ্গে লড়াই ক'রেই জিভ বেরিয়ে আসে, তার উপর আবার খাঁড়ার ঘা জোঁক ছাড়াও।

অজস্র চড়াই উৎরাই। শুধু আরোহণ আর অবরোহণ। শারীরিক শ্রমের অতলস্পর্শী সাগরে কয়েকশত মানুষের নিরন্তর অবগাহন। অভিযাত্রী দল চলেছে। শেরপারা চলেছে। পাশে শেরপানিরাও আছে। ভারবাহী এক বিরাট বাহিনী চলেছে। কোনো পর্বতচূড়ায় দাঁড়িয়ে এদের দিকে তাকালে মনে হবে যেন এরা গতিশাল এক বিরাট অজগর সাপ।

দিনের পর দিন কাটে। মানুষের ঘামের ফোঁটা আর দুশ্চিন্তা দুর্গম পথকে বশ ক'রে আনে। কাঠমাণ্ডু বহুদূর, বহু নীচে।

অভিযাত্রী দল নামচেবাজার এসে পৌঁছলেন! প্রায় দু সপ্তাহ সময় লাগল।

নামচেবাজার। শেরপাদের পিতৃভূমি। সাগরপৃষ্ঠ থেকে ১৩,০০০ ফুট উঁচুতে। আর কাঠমাণ্ডু থেকে দূরত্ব হবে ১৭০ মাইল। একটানা ভ্রমণের পর অভিযাত্রী দল এখানে কিছুদিন বিশ্রাম নিলেন।

শেরপাতে শেরপাতে মেলামেশা সে এক দেখবার বিষয়। বলিষ্ঠকায় এইসব পর্বতাত্মজের হাসি, সে এক শোনবার জিনিস। অভিযাত্রী দল পৌঁছতে না পৌঁছতেই গোটা গ্রাম জড়ো হলো এসে আর তর সয়না কারো। হাসাহাসি, ঘেঁষাঘেঁষি শুরু হ'য়ে গেল। এস এস, ঘরে এস। কেমন আছ? ভাল ছিলে? ততক্ষণে আগন্তুক শেরপারা প্যাকিং খুলে ফেলেছে। বের করতে শুরু করেছে নানা উপহার। একী, রুমাল? তালা? বিস্কুট? সাবান? এক একটা উপহার বের হয়, এক একটা হাত এগিয়ে এসে তা গ্রহণ করে। খুশির ঢেউ বুক ঠেলে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। আর হাসির তরঙ্গ প্রাণে দোলা লাগায়। কাঠমাণ্ডু থেকে বেরিয়ে দুদিনের পথ পার হ'য়ে ঝড়ের হাতে যখন শেরপারা পড়েছিল (সে কথা এখন, এই উপহারগুলো বিলি করবার সময় এক এক ক'রে মনে পড়ছে), তখন কি আপ্রাণ লড়েছিল এরা মালগুলো বাঁচাবার জন্যে। সেই বিসেঙ বৌদ্ধমঠে কি তাদের হয়রানি! হা হা ক'রে ঝড় ছুটে এল। কি প্রচণ্ড তার গতিবেগ! এই বুঝি সব উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঝড়কে এরা প্রতিহত করল। একটি মানুষ নয়, এক কুচি মাল মাল নয়, কারোরই ক্ষতি করতে পারল না ঝড়। ঝড় থামল কিন্তু বিপদ থামল না। চড়চড় ক'রে নামল বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি। আর

কি বড় বড় সব শিল। মাথায় পড়লে খুলি ভেঙে যায়! তিন ঘণ্টা ধ'রে সমানে লড়াই চলল মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে। মানুষ জিতল অশেষ পরিশ্রমের মূল্যে। তবে সে মূল্য দেওয়া যে সার্থক হয়েছে তাতো তাদের এখনকার এই খুশীমুখ দেখেই বোঝা যায়। নামচেবাজার নেপাল ও তিব্বতের মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ব্যবসা বাণিজ্যের লেনদেন এই দু'টো দেশের মধ্যে এখান থেকেই হয়। এখানে বাসিন্দা বলতে মাত্র ৬০টি ঘর। শোলো খুম্বু জেলায় এই ষাট ঘরের মতো গুরুত্ব আর কিছুরই নেই।

কর্ণেল হাণ্টের দল এখানে একটু দম নিয়ে নিলেন। তারপর আরো উপরে একটু উত্তরে, থায়াংবক মঠে গিয়ে শিবির ফেললেন। থায়াংবকের বৌদ্ধ শ্রমণরা এঁদের অভ্যর্থনা করলেন। আশীর্ব্বাদ জানালেন।

দুধকুশী আর ইমজা খোলা নদী দুটোর সংগমস্থলেই এই মঠ। কর্নেল হাণ্ট ঠিক করলেন, এখানে তিন সপ্তাহ কাটাবেন। তারপর এখান থেকেই এভারেস্ট অভিযান শুরু করবেন।

কর্নেল হাণ্টের হাতে এখন অনেক কাজ। তাঁর দলের লোক-দের এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে। খাপ খাইয়ে নিতে হবে তার সঙ্গে। আশেপাশে লোক পাঠিয়ে দেখতে হবে নতুন কোনো পথ মেলে কি না। সমস্ত জায়গাটা জরিপ করাও দরকার।

তিন সপ্তাহ কেটে গেল। বহু যায়গা জরিপ করা হলো। অনেক পাহাড়ে চড়া হলো। কিন্তু সে তো স্বতন্ত্র কাহিনী।

কর্নেল হাণ্ট পরিকল্পনা করলেন, আটটা কি নয়টা শিবির স্থাপন করবেন। প্রথম শিবিরটি থাকবে থায়াংবক মঠে। আর

সব থেকে উঁচুর শিবিরটা স্থাপন করবেন ২৭ হাজার থেকে ২৮ হাজার ফুটের মধ্যে কোনো এক জায়গায়।

থায়াংবক মঠ ছেড়ে এগিয়ে গেলেই খুম্বু হিমবাহ। কর্নেল হাণ্ট এখানকার পাতলা বাতাসে তাঁর দলের লোকদের চলতে ফিরতে অভ্যস্ত করিয়ে নিলেন। যত উপরে উঠবে বাতাস ততই পাতলা। সমতলের লোকেরা শ্বাসপ্রশ্বাসে যতটা অক্সিজেন পায় উপরে অক্সিজেন তার থেকে ঢের কম। সমতলের কোনো লোককে চট করে এভারেস্টের চূড়ায় তুলে দেওয়া হ'লে সে নব্বই সেকেণ্ডও বাঁচবে কিনা সন্দেহ। তাই, একমাত্র উপায় হচ্ছে, বেশ কিছুদিন ধরে এসব অঞ্চলে থেকে, এখানকার আবহাওয়া দুরস্ত ক'রে নেওয়া।

নগাধিরাজ হিমালয় এভারেস্টের কাছে এসে ত্রিশীর্ষ ত্রিচূড় হয়েছেন। নাপ্‌সে, লোৎসে আর এভারেস্ট। তিনটি চূড়া। ত্রিমূর্তি। ট্রিনিটি। যেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। জানি না অনাদি অতীতে আমাদের কোনো পর্বতবিহারী পূর্বপুরুষ হিমালয়ের উচ্চ-শীর্ষ দেখতে এসে, এই তিনটি চূড়া দেখেছিলেন কিনা। এবং ত্রিমূর্তির কল্পনা তাঁর মনেই প্রথম উদয় হয়েছিল কিনা কে বলবে।

একেবারে গোড়ার শিবিরটি থাকল থায়াংবক মঠে। থায়াংবক মঠই খুম্বু অঞ্চলের শেষ মনুষ্য-বসতি। এখান থেকে দুদিনের পথ এগিয়ে গেলেই পশ্চিম 'কম্'। এক বিস্তীর্ণ তুষারখাত। মনে হয় যেন বিরাট এক গামলায় কেউ অন্তহীন আইসক্রীম বানিয়ে রেখেছে।

থায়াংবকে এসে আবার শেরপাদের সঙ্গে গোলমাল শুরু হলো। সাহেবরা এখানে শেরপাদের তাঁবু, পোষাক, জুতো প্রভৃতি

সরঞ্জাম দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন ফিরে এসে প্রত্যেকটি জিনিস হিসেবমত ফেরৎ দিতে হবে। আর যাবে কোথায়? শেরপারা ক্ষেপে উঠল। এই সমস্ত জিনিষপত্র শেরপারা সেই প্রথম অভিযানের সময় থেকে স্মারক হিসাবে রেখে আসছে। আজ পর্যন্ত কেউই ফেরৎ চায়নি। এইরকম মনোমালিন্য চলতে থাকলে এভারেস্ট অভিযান সফল হবে কিনা সে বিষয়ে তেনজিং সন্দিহান হলেন।

কর্নেল হাণ্টকে তিনি বললেন, "জিনিসপত্র ফেরত দেবার প্রস্তাব আমি ওদের কাছে করতে পারব না সাহেব। করতে হয় তুমি করো। তবে তুমি যদি এ বিষয় নিয়ে ওদের উপর চাপ দাও, তবে এ বছরে তোমাকে আর এভারেস্টে উঠতে হবে না।"

তেনজিং যা ভয় করছিলেন তাই ঘটল। সাজসরঞ্জাম ফেরৎ দিতে হবে শুনে সবাই বেঁকে বসল। কেউ আর এগুতে চায় না। তেনজিংএর সহকারী পাসাং ফুটার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত দেখে আগেই চটেছিলেন। সাহেবরা টিনের খাবার খাবে, আর শেরপাদের দেওয়া হবে স্থানীয় খাদ্য, এ কেমন ব্যবস্থা? পাসাং ফুটারের আত্মাভিমানে ঘা লাগল। ধুত্তেরি বলে তিনি থায়াংবক থেকে ফিরে চ'লে গেলেন। তাঁর যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আরো কয়েকজন শেরপা ফিরবার জন্য তৈরি হলো। তেনজিং দেখলেন সর্বনাশ! তাড়াতাড়ি শেরপাদের প্রবোধ দিতে গেলেন। বোঝালেন, এভারেস্ট যখন নাগালের মধ্যে, তখন ফিরে যাওয়াটা বুদ্ধির কাজ হবে না। চল আগে এভারেস্টে উঠি, যদি উঠতে পারি তখন এসব নিয়ে বোঝাপড়া হবে।

শেরপারা শেষ পর্যন্ত বললে, "আচ্ছা।"

কিন্তু তখনও সব কিছু 'আচ্ছা' হয়নি। আবার ঝামেলা বাধল। এবার মাল বওয়া নিয়ে। সাহেবরা চায় ৬০ পাউণ্ড করে বোঝা এক একজন শেরপার পিঠে চাপাতে। কিন্তু তারা সাফ বলে দিল ৬০ পাউণ্ড বোঝা তারা বইতে পারবে না। তেনজিং আবার সালিশ করলেন, প্রত্যেককে ৫০ পাউণ্ড ক'রে বইতে হবে। এ ব্যবস্থায় আর কেউ আপত্তি করল না। এর পর আর বিশেষ গোলমাল হয়নি। গোড়ার শিবিরে পৌঁছে খাবারও সবাইকে একরকম দেওয়া হলো। সাহেবরা বললেন, যার কাছে যে জিনিস আছে সেগুলো ভাল কাজ যারা দেখাবে তাদের পুরস্কার স্বরূপ দিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সব গোলমালের শান্তি হলো।

পশ্চিম 'কম্' থায়াংবক মঠ থেকে দুদিনের পথ। নাপ্‌সে লোৎসে আর এভারেস্ট—এই তিনটি শৃঙ্গের মধ্যে এই বিস্তীর্ণ তুষারভূমি প্রসারিত হ'য়ে আছে। সমুদ্রতল থেকে ২৩০০০ ফুট উঁচুতে। যেমন দুর্গম, তেমনি ভয়াবহ।

এই পশ্চিম 'কমে'র মধ্য দিয়ে পথ বানাতে হবে। শিবির বসাতে হবে। ধাপে ধাপে মালপত্র ব'য়ে নিয়ে নিয়ে একেবারে অগ্রবর্তী শিবিরে পৌঁছে দিতে হবে। পথ শুধু বরফ কেটে তৈরি করলেই চলবে না, তাকে টিঁকিয়েও রাখতে হবে, নইলে যারা এগিয়ে গেছে, ফিরবে কেমন ক'রে?

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে হাতাহাতি সংগ্রাম তা শুরু হলো এই পশ্চিম 'কম্' থেকে। কুড়ুলের ঘায়ে মানুষ সকালের দিকে ধাপ কাটে, অপরাহ্নের প্রবল তুষারপাতে তা কোথায় তলিয়ে যায়। দড়ির পরে দড়ি জুড়ে মানুষ এগিয়ে যাবার পথ গড়ে, প্রচণ্ড তুষারঝটিকা কোথায় তা উড়িয়ে নিয়ে যায়। প্রকৃতি আর মানুষের

এই ভীষণ পাঞ্জার লড়াই এক মুহূর্তের তরেও বিশ্রাম পায় না। প্রতিটি পদক্ষেপই সেখানে মারাত্মক সংগ্রাম। প্রতিবার নিঃশ্বাস নেওয়াও সেখানে প্রাণপণে লড়াই করা।

এক মরণপণ লড়াই শুরু হয়ে গেল। প্রকৃতির বাধাকে কম্বু-ইয়ের গুঁতোয় ঠেলতে ঠেলতে অভিযাত্রী দল একটু একটু ক'রে এগিয়ে চললেন অভিযাত্রীদলের মধ্যে বাছাই করা পর্বতারোহী-রাই শুধু চললেন। আর চলল নিতান্ত আবশ্যকীয় মালগুলো ব'য়ে নিয়ে বাছাই করা শেরপারা। ওঁরা একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছেন আর শিবির পড়ছে এক দুই তিন চার পাঁচ শিবির গাড়তে গাড়তে কর্নেল হাণ্টের দল চলল। তেনজিং হিলারী ইভানস, বুর্দিলোঁ, নয়েস্, কর্নেল লোয়ে, ব্যাণ্ড. উইলী, ওয়েস্টম্যাকট্, গ্রগরী আর স্বয়ং কর্নেল হাণ্ট তাঁরা এগিয়ে চলেছেন। শিবির পড়ছে ছয় সাত সঙ্গে সঙ্গে শেরপারা চলেছে আন্নুলু, দা নাঙ্গিল, আঙ তেনজি (এভারেস্ট-বিজয়ী তেনজিং নয়, অন্য লোক)। চলেছে প্রৌঢ় দাবা থোন্দপ, বহু অভিযানে সে অভিজ্ঞ। আর চলেছে কিশোর শেরপা তোপগায়। সতের বছর মাত্র বয়েস। এই তার প্রথম অভিযান।

সমস্ত পথটাকে তিনটে ভাগ করা হলো। প্রথমটুকু পশ্চিম 'কম' অতিক্রম করা, দ্বিতীয়টুকু লোৎসে ডিঙিয়ে যাওয়া আর শেষটুকু, দক্ষিণ 'কল্' অতিক্রম করা। তারপরই ঝাঁপিয়ে পড় এভারেস্টের উপর।

সময় ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হ'য়ে আসছে। কর্নেল হাণ্ট স্থির কর-লেন, আর মুহূর্তমাত্র দেরি নয়। যত সম্ভব সত্বর দক্ষিণ 'কল্'-এ মালপত্র পৌঁছে দিতে হবে। বারজন শেরপা আর একজন পর্বতা

রোগী নিয়ে দল তৈরী করা প্রথমে ঠিক হয়েছিল। পরে মত বদলে আটজন ক'রে শেরপা নেওয়া হলো। বাকী চারজন কবে রিজার্ভ রাখা হলো।

কর্নেল হাণ্ট নয়েসের দলের সঙ্গে পঞ্চম শিবির পর্যন্ত এলেন। সেদিন ১৯শে মে। ঠিক হলো নয়েস মালপত্র নিয়ে সপ্তম শিবির পর্যন্ত যাবেন। তার পরদিন সপ্তম শিবির থেকে মালপত্র নিয়ে দক্ষিণ 'কল্'-এ পৌছবেন। পৌছে, ওইদিনই যদি শিবিরে ফিরে আসা অসম্ভব দেখেন, তাহলে ঠিক হলো, নয়েস্ মালপত্র আব শেরপাদের সপ্তম শিবিরেই বেখে দেবেন ; শুধু তিনি, মাত্র একজন শেরপাকে নিয়েই দক্ষিণ 'কল্' পর্যন্ত রাস্তা তৈরি ক'রে আসবেন।

২০শে মে নয়েস্ দলবল নিয়ে সপ্তম শিবিরে হাজির হলেন। উত্তেজনায় সে রাত্রে কর্নেল হাণ্টের ভাল বিশ্রাম হলো না। ২১শে মে সকাল থেকেই কর্নেল হাণ্ট চেয়ে বইলেন দিগন্তপ্রসারী শুভ্রতার মধ্যে সেইদিকে, যে দিকে নয়েস গিয়েছেন। নটা, দশটা--ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলেছে। সামান্য টিকটিক্ আওয়াজটাও হাণ্টের হৃদপিণ্ডে ধ্বক্ ধ্বক্ আঘাত করছে। দিনটা পরিষ্কার। বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়। হঠাৎ প্রায় এগারোটার সময় কর্নেল হাণ্টেব হৃদপিণ্ডে ধ্বক্ ক'রে একটা জোর আঘাত পড়ল। সীমাহীন অকলঙ্ক শুভ্রতার মধ্যে বহুদূরে ছুটো কালো বিন্দু ভেসে উঠেছে। নয়েস্ বেরিয়ে পড়েছে তাহলে। সঙ্গে আন্নুলু শেরপা। হাণ্ট দেখলেন বিন্দু ছুটো দড়ি বেয়ে বেয়ে সোজা উঠে যাচ্ছে। অন্যান্য শেরপাদেব আর নিতে পারে নি। তারা শিবিরে রইল। শেবপাদের নিতে না পারায় কর্নেল হাণ্ট একটু হতাশ হলেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি 'কল্'-এ পৌছতে চাইছিলেন।

ওদিকে পঞ্চম শিবির থেকে উইলী যাত্রা করেছেন। তিনিও সেইদিনই সপ্তম শিবিরে পৌঁছে যাবেন। তাহলে সপ্তম শিবিরে ভিড় প্রচুর বেড়ে যাবে। তবে এটা মেনে নেওয়া ছাড়া আর অন্য উপায়ও ছিল না। কর্নেল হাণ্টের একমাত্র লক্ষ্য এখন 'কল্'-এ পৌঁছনো, যত তাড়াতাড়ি পারা যায়। তাঁবু, অক্সিজেন, কুকার, স্টোভ, খাবার - এগুলো নিয়ে যাওয়া চাই-ই।

হঠাৎ এক আপদ শুরু হলো। সপ্তম শিবির থেকে কর্নেল হাণ্টের কাছে খবরাখবর আসছিল যে বেতার যন্ত্রটিতে, তা গেল বিগড়ে! নয়েস্ বা উইলীর কোনো খবরও পাওয়া গেল না। নয়েস্ 'কল্' পর্যন্ত গিয়ে শিবিরে ফিরে এসে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে? গুরুতর পরিশ্রমে আরেকবার যেতে যদি অক্ষম হ'য়ে পড়ে, তখন?

কর্নেল হাণ্ট কালবিলম্ব না ক'রে ইভান্স আর হিলারীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন. সিদ্ধান্ত হলো, আরো দুজনকে পাঠাবার। নয়েসের সাহায্যের জন্য হিলারী আর তেনজিং-ই শেষ পর্যন্ত রওনা দিলেন।

পর্বতারোহণ একজনের সাধ্য নয়। একটা দলের সমবেত প্রচেষ্টারই সেখানে প্রয়োজন। কর্নেল হাণ্ট তাঁর দলকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রত্যেকেরই এক একটা বিশেষ দায়িত্ব ছিল। তেনজিং ছিলেন শেরপাদের সর্দার। মালপত্র যাতে ঠিক-মত পৌঁছয় তার তদারক করা ছিল তাঁর বিশেষ দায়িত্ব। কর্নেল হাণ্ট প্রত্যেক অভিযাত্রীর সঙ্গে দশজন শেরপাকে জুড়ে এক একটা দল করেছিলেন। শিবিরে শিবিরে প্রয়োজন মত মাল যাতে পৌঁছে দিতে পারা যায়, এ ব্যবস্থা সেজন্যই করা হয়েছে। এ ছাড়া পাহাড়ে উঠবার জন্য দুজন ক'রে অভিযাত্রী নিয়ে কয়েকটা

দল তৈরি করা হলো। এভারেস্ট বিজয়ের জন্য এইরকম দুটো দলকে বাছা হলো। প্রথম দলে থাকলেন চার্লস ইভান্স আর টম বুর্দিলোঁ। দ্বিতীয় দলে থাকলেন তেনজিং আর হিলারী। ব্যবস্থা হলো, ইভান্স আর বুর্দিলোঁ ঢাকা 'অক্সিজেন সেট্' নেবেন, আর খোলা অক্সিজেন সেট ব্যবহার করবেন তেনজিং আর হিলারী।

ইভান্স আর বুর্দিলোঁর প্রধান কাজ ছিল যতটা সম্ভব এগিয়ে গিয়ে পথঘাট সম্পর্কে পরিচয় নেওয়া, আর যদি সম্ভব হয়, তবে এভারেস্টে উঠবার একটা চেষ্টা করা।

তেনজিং আর হিলারী ছিলেন 'রিজার্ভ'। আগের দলটি অকৃতকার্য হ'লে তবে এঁদের চেষ্টা শুরু হবে। দারজিলিঙ থাকতে তেনজিং-এর যে দুর্বলতা ছিল, অভিযান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তা কেটে যেতে লাগল। যতই তিনি এভারেস্টের কাছে এগিয়ে যেতে লাগলেন, ততই তাঁর দেহে বলের সঞ্চার হতে থাকল। থায়াংবক পৌঁছেই সে কথা তিনি তাঁর দারজিলিঙের বন্ধু মিত্র-বাবুকে লিখে পাঠালেন।

আগেই বলেছি, পাহাড়ে চড়া একজনের কাজ নয়। পিঁপড়েদেব চাল এখানে মানুষকে অনুসরণ করতে হয়। এক একটা দল এক একটা শিবিরে মালপত্র পৌঁছে দেয়। দিয়ে তারা ফিরে আসে গোড়ার শিবিরে। গোড়ার শিবির থেকে নতুন দল যাত্রা করে, সেই শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম নেয়। নিয়ে পরদিন তারা উঠে যায় আরো এক ধাপ উঁচু শিবিরে, মালপত্র সেখানে নামিয়ে রেখে ফিরে আসে। যাত্রা করে নতুন আরেকটা দল। শিবিরের যেমন নম্বর দেওয়া থাকে এক দুই তিন ....., তেমনি দলেরও নম্বর থাকে প্রথম দ্বিতীয়

তৃতীয় ....। কোন্ দল কতদূর উঠবে সে সমস্তই আগে থেকে ঠিক করা থাকে।

গোড়ার শিবিরকে ইংরেজীতে বলে 'বেস ক্যাম্প'। কর্নেল হান্টের 'বেস্ ক্যাম্প' ছিল থায়াংবক মঠে। এই বেস্ ক্যাম্পই হলো আসল ঘাঁটি। কর্নেল হান্ট কাজের সুবিধের জন্য ২১০০০ ফুট উঁচুতে আর একটা 'বেস্ ক্যাম্প' করলেন। এই 'বেস্ ক্যাম্প' থায়াংবক থেকে ৯০০০ ফুট উঁচুতে। এই অগ্রবর্তী 'বেস্ ক্যাম্প'টা থেকেই অভিযান পরিচালিত হ'তে থাকল।

একুশে এপ্রিল অভিযাত্রীরা প্রথম 'বেস্ ক্যাম্পে' এসে পৌঁছেছিলেন।

আর তেনজিং আর হিলারী চতুর্থ শিবিরে পৌঁছলেন ১৫ই মে। এখান থেকেই তাঁরা বুর্দিলোঁ আর ইভান্সের পিছু নিলেন।

থায়াংবক থেকেই তেনজিং পরামর্শ দিচ্ছিলেন সঙ্গে ক'রে ১০।১৫টা বড় বড় খুঁটি নেবার জন্য। দক্ষিণ 'কল্'-এ যাবার রাস্তা সুবিধের নয়। এমন সব বড় বড় গহ্বর আছে যা টপকানো যায় না, সাঁকো বানিয়ে পার হ'তে হয়। গতবারে সুইসদের সঙ্গে অভিযানে এসে তেনজিং-এর সে অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর পরামর্শটা প্রথম দিকে কর্নেল হান্ট নিতে চান নি। খুঁটি বইতে গেলে বেশী লোক নিতে হয়। এক একটি খুঁটি তিনজনের কমে বইতে পারা যায় না। বেশী লোক নিলে খরচটাও বেড়ে যাবে। কর্নেল হান্ট সেটা ভেবেই ইতস্তত করছিলেন।

হিলারী বললেন, "তেনজিং, খুঁটির কি দরকার? সঙ্গে তো অ্যালুমিনিয়মের একটা মই-ই আছে।"

তেনজিং হেসেছিলেন। খুঁটির কি দরকার! টের পাবে

সাহেব, আরো কিছুটা ওঠো। হিমালয়ের অভিজ্ঞতা বেশী নেই তো। যে সব শেরপা সুইস্‌দের দলে ছিল তারাও সমর্থন জানাল তেনজিংকে। অগত্যা কর্নেল হাণ্ট সম্মত হলেন। সম্মত হ'য়ে যে কি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা পরে প্রতি পদে বুঝেছিলেন।

ইভান্স আর হাণ্ট তৃতীয় শিবিরে আগেই উপস্থিত হয়েছিলেন। তেনজিংরা পিছনে আসছিলেন। ওঁরা দু নম্বর শিবিরে অনেক মাল পৌঁছে দিলেন। রাতটা সেখানে বিশ্রাম নিয়ে পরদিন তৃতীয় শিবিরে পৌঁছলেন। মালপত্র সেখানে রেখে সেইদিনই তাঁরা থায়াংবক শিবিরে নেমে গেলেন।

এই সময় একদিন হিলারী দ্বিতীয় শিবিরের কিছু নিচুতে পা পিছলে এক গহ্বরের মধ্যে প'ড়ে গেলেন। প্রথম কয়েক মুহূর্ত হিলারী হতচকিত হ'য়ে গেলেন। তারপর বিপদটা বুঝতে পারলেন। হিলারী ভীমবেগে গড়িয়ে চলছেন এক অতলস্পর্শী গহ্বরের দিকে। কত হাজার ফুট গভীরে কে জানে! ভয়ে তাঁর প্রাণ উড়ে গেল। আর্তস্বরে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠলেন 'তেনজিং তেনজিং।'

তেনজিং আগেই দেখেছিলেন। হিলারী আর তাঁর দেহ একই দড়িতে বাঁধা। হিলারীর দড়িটা মাথায় চট করে জড়িয়ে নিলেন। প্রাণপণ শক্তি দিয়ে হিলারীর পতন রোধ করলেন। প্রচণ্ডবেগে গড়িয়ে পড়তে পড়তে এক হ্যাচকা টান লেগে গতি থেমে গেল। শূন্যে ঝুলতে লাগলেন হিলারী। তারপর তেনজিংএর আকর্ষণে একটু একটু ক'রে উপরে উঠলেন। কৃতজ্ঞতায় হিলারীর মুখে বাক্‌ ফুটলো না। শুধু বললেন, "তেনজিং, সাবাস।"

চতুর্থ শিবিরে দুজনের মধ্যে হিলারীই আগে পৌঁছলেন, তেনজিং তার পরে। তেনজিং সেখানে উপস্থিত হ'য়েই জায়গাটা চিনতে পারলেন। সুইস্‌রা গতবারে এখানেই তাদের শিবির ফেলেছিল। যাবার সময় অনেক খাবারদাবার, অনেক জিনিসপত্র বরফের নীচে পুঁতে রেখে গিয়েছিল, যদি কারও কাজে লাগে। তেনজিং এখানে ওখানে খুঁড়ে প্রচুর জিনিস বের করলেন। প্রচুর খাবার পাওয়া গেল, আর কয়েকটা অক্সিজেন-বোতল।

জিনিসগুলো কেমন আছে, দেখবার জন্য তেনজিং খানিকটা লেবুর গুঁড়ো বের ক'রে জলে গুলে পান করলেন। চমৎকার। কিছুই নষ্ট হয়নি। সবাই খুব খুশী। অন্তত নীচের শিবির থেকে খাবার ব'য়ে আনবার পরিশ্রমটা বেঁচে গেল। তেনজিং সেইদিনই থায়াংবক ফিরে গেলেন।

অগ্রবর্তী 'বেস্ ক্যাম্প' আর থায়াংবকে তেনজিং আর হিলারীকে বারকয়েক আনাগোনা করতে হলো। মালপত্র আনবার তদারকের জন্যও বটে, আবার ওঠানামায় অভ্যস্ত হবার জন্যও বটে। যা হোক, শেষ পর্যন্ত যা যা মাল দরকার সবই যখন পৌঁছে গেল অগ্রবর্তী 'বেস ক্যাম্প'-এ, তখন শুরু হলো এভারেস্টের উপর চরম আঘাত দেবার জল্পনা কল্পনা।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত যা হলো, তা আগেই বলেছি। কথামত বুর্দিলোঁ আর ইভান্স প্রথমে যাত্রা করলেন। আর তার ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে তেনজিং আর হিলারী ওঁদের অনুসরণ করলেন।

২২শে মে। সোয়া তিন ঘণ্টা পর চতুর্থ শিবির থেকে তাঁরা সপ্তম শিবিরে পৌঁছলেন। এই শিবিরটা লোৎসের মুখোমুখী, ২৪০০০ ফিট উপরে। আলফ্রেড গ্রেগরী আর জর্জ লোয়ে আগেই

এসে পড়েছেন সেখানে। তাঁদের সঙ্গে শেরপা আছে তিনজন— আঙ নিমা, আঙ তেম্বার আর পেম্বার। কথা আছে এঁরা দক্ষিণ-পূর্ব দিকের চূড়ার দিকে আরো এগিয়ে মালপত্র পৌঁছে দিয়ে আসবেন। তেনজিংদের সঙ্গেও পাঁচজন শেরপা আছে। তাঁরা দক্ষিণ কল্ পর্যন্ত ওঁদের পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবেন।

সে রাত্রে অক্সিজেন টানতে টানতে চারজনে দিব্যি ঘুমিয়ে নিলেন। পরদিন সকালে উঠেই ওঁরা যাত্রা করলেন দক্ষিণ কল্-এর দিকে। সাড়ে নটার সময় ওঁরা যখন লোৎসে হিমবাহের শীর্ষে, হঠাৎ হিলারীর নজরে পড়ল, দিগন্তবিসারী শ্বেতশুভ্র মহা তুষার-ক্ষেত্রের দক্ষিণপূর্ব দিকে যে চূড়াটি তার গায়ে দুটি সচল বিন্দু ফুটে উঠেছে। ইভান্স আর বুর্দিলোঁ চলেছেন এভারেস্টের দিকে। একটু পরে কর্নেল হাণ্টকে দেখা গেল। শেরপা দা নাঙ্গিলের সঙ্গে খাবার আর অক্সিজেন ব'য়ে নিয়ে চলেছেন, বুর্দিলোঁরা যেদিকে গেছেন সেইদিকে। পরের দলটির কাজে লাগবে সেগুলো। লোৎসে পার হ'য়ে হিলারীরা যখন দক্ষিণ কল্-এ এসে পৌঁছলেন, তখনও তাঁরা হাণ্টদের দেখতে পাচ্ছিলেন।

দক্ষিণ কল্-এর শিবিরে কর্নেল হাণ্ট দা নাঙ্গিলের সঙ্গে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁদের অবস্থা অতি শোচনীয়। কর্নেল হাণ্ট যে অক্সিজেন নিয়ে গিয়েছিলেন, তা উপরেই রেখে এসেছিলেন পরের দলটির ব্যবহারে লাগবে ব'লে। বিনা অক্সিজেনে এই পথটুকু আসতে ওঁদের প্রায় জীবন বেরিয়ে গেছে। কর্নেল হাণ্টের অবস্থা দেখে তেনজিং ২০০ ফুট উঠে গিয়ে হাণ্টকে শিবিরে আসতে সাহায্য করলেন। হাণ্ট নবম শিবির স্থাপন করতে পারেন নি। সুইস্‌রা গতবারে যেখানে সপ্তম শিবির ফেলেছিল, তিনি তার সামান্য

উঁচুতে উঠেছিলেন। প্রায় ২৭৩৫০ ফুট পর্যন্ত উঠতে পেরেছিলেন।

এভারেস্ট বোধ হয় আঁচ করেছিল, তার বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তাই সাবধান হলো। দুদিন ধ'রে বাতাসের বেগ ক্রমাগত বাড়ছিল। তা উপেক্ষা ক'রেই লোৎসে টপকিয়ে অভিযাত্রীরা দক্ষিণ কল্-এর শিবিরে এসে বিশ্রাম নিলেন। ঝড়ের বেগে আরো একদিন সেখানে অচল হ'য়ে রইলেন। তারপর ২৬শে মে, ইভান্স আর বুর্দিলোঁ দক্ষিণ কল্-এর শিবির থেকে ঢাকা অক্সিজেন সেট্ নিয়ে যাত্রা করলেন। যাত্রার গোড়াতেই বাধা পড়ল। অক্সিজেন সেট্‌টি বিগড়ে গেল। সেগুলো মেরামত করতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগল। তারপর দুজনে রওনা দিলেন। সাড়ে তিনটের সময় দেখা গেল বুর্দিলোঁ আর ইভান্স পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর পাহাড়টাকেও আর দেখা গেল না। মেঘের পর মেঘ জ'মে পাহাড়টা ঢেকে দিল। শিবিরে ব'সে গভীর উৎকণ্ঠায় কর্নেল হান্ট অপেক্ষা ক'রে রইলেন সংবাদের। এভারেস্টে ওরা উঠতে পারল কি? প্রায় সাড়ে ছটায় ইভান্স আর বুর্দিলোঁ ক্লান্ত, পর্যুদস্ত হ'য়ে ফিরে এলেন। এভারেস্ট তখনো অজেয়। এঁরা শুধু দক্ষিণ চূড়ায় উঠেছেন। মূল চূড়াটা তখনও বাকী। দক্ষিণের চূড়াটা আসল চূড়া নয়। আসল চূড়া আরো উঁচুতে। আরো তিনশ ফুট কিংবা তারো বেশী। আরো কয়েকশ ফুট অসম্ভব আরোহণ, তারপর আকাঙ্ক্ষিত জয়লাভ।

সে জয়লাভ তাঁরা করতে পারেন নি, তা ব'লে তাঁদের এই অমানুষিক পরিশ্রম বিফল হয়নি। দক্ষিণ চূড়া পর্যন্ত পথ তাঁরা তৈরি ক'রে আসতে পেরেছেন। পরবর্তী অভিযাত্রীদের পথ কিছুটা সুগম করেছেন। সেটাও একটা বড় কীর্তি।

তেনজিং আর হিলারী প্রায় ১০০ ফুট এগিয়ে গিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন।

শিবিরে ফিরতেই তেনজিং ওঁদের মুখ থেকে অক্সিজেন মুখোশ খুলে ফেললেন। তারপর লেবুর জল খেতে দিলেন। এক একজন প্রায় সের দুয়েক ক'রে লেবুর জল ঢক্ ঢক্ ক'রে খেয়ে ফেললেন।

একটু সুস্থ হ'লে তেনজিং ইভান্সকে পথের খবর জিজ্ঞাসা করলেন।

ইভান্স বললেন, "তেনজিং, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি এবারে এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে পারবে। তবে পথ অতি দুর্গম। আমার মনে হয়, তোমাদের পৌঁছতে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা লাগবে।"

তেনজিং বারবার ইভান্সকে জিজ্ঞাসা করেন, "পথ কেমন, অকপটে বল সাহেব।"

"বললাম তো," ডাঃ ইভান্স বললেন, "আগামীবারে তোমাকে এখানে আসতে হবে না। আবহাওয়াটা যদি ভাল থাকে এইরকম, তো তুমি এইবারই উঠতে পারবে। তবে দেখো, দুর্ঘটনা বাঁচিয়ে চ'লো।"

* * *

হিমালয় মানুষের পায়ের শব্দ শুনেছিল। প্রকৃতি বুঝতে পেরেছিল, এভারেস্টের বিপদ এবার ঘনিয়ে এসেছে। তাই তারাও তোড়জোড় শুরু করল। মানুষের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার মানসে প্রকৃতি প্রতি-আক্রমণ করতে লাগল। আর সে আক্রমণের রূপ যে কী ভীষণ, কী প্রচণ্ড তা টের পেলেন অভিযাত্রীরা, ২৮শে মে'র রাত্রে, অষ্টম শিবিরে কয়েকটা তাঁবুর মধ্যে শুয়ে।

কদিন ধরেই বাতাসের বেগ বাড়ছিল। এখন তা চরমে

পৌঁছল। ভীম বেগে প্রবাহিত ঝটিকার সঙ্গে প্রবল তুষারপাত শুরু হোলো। তাপমাত্রা যেন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই কমতে লাগল। বেগ যদি আর একটু প্রবল হয়, তবে আর রক্ষা নেই। তাঁবু উড়ে যাবে, তাঁরাও উড়ে যাবেন। তুষারবর্ষণ যদি না থামে, অবিরল পড়তে থাকে, তবে তাঁরা হয়ত তার নীচে সমাধিস্থ হ'য়ে যাবেন।

শীতের চোটে অষ্টম শিবিরে সে রাত্রে কারো ভাল ঘুম হোলো না। কর্নেল হান্ট,বুর্দিলোঁ, ইভান্স--ওঁরা একেই সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন, তার উপরে শীতের এই প্রচণ্ড আক্রমণ--ওঁরা আরও কাহিল হ'য়ে পড়লেন। লোয়ে, গ্রেগরী আর হিলারীর অবস্থা অত খারাপ না হ'লেও, তাঁরাও বিশেষ অশ্বস্তি ভোগ করছিলেন। এমন কি এভারেস্টের কোলে যাঁর জন্ম সেই তেনজিং-এরও স্বস্তি ছিল না।

পরদিন বাতাসের বেগ সামান্য কমল। কিন্তু তখনও বেগ ভীষণ। কর্নেল হান্ট, বুর্দিলোঁ আর ইভান্স নেমে গেলেন। তাঁরা এতই দুর্বল হ'য়ে পড়েছিলেন যে লোয়ে আর হিলারী তাঁদের ধরাধরি ক'রে নামিয়ে দিলেন। আঙ তেম্বার ব'লে যে শেরপাটির মাল ব'য়ে আরও উপরে উঠবার কথা ছিল, অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় তাঁকেও ফেরত পাঠাতে হলো।

সেদিনও সমস্তক্ষণ, সমস্ত রাত্রি ধ'রে হিমেল ঝড়ের মাতামাতি চলল আর তুষার অঝোর ধারায় ঝরতে লাগল। তেনজিং আর হিলারী এগিয়ে যাবার জন্য কয়েকবার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন কিন্তু বৃথা। প্রকৃতির সেই ভয়াবহ রুদ্রাণী মূর্তির মুখোমুখী হওয়া তাঁদের সাধ্য কি। তাঁরা ভোরের প্রতীক্ষায় রইলেন।

পরদিন ভোরের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতি প্রসন্না হলেন। বাতাসের বেগ অনেকটা ক'মে এল, কিন্তু নতুন এক সর্বনাশের সম্মুখীন হ'য়ে হিলারী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে গেলেন। শেরপা পেম্বার গত রাত্রে নিদারুণ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। তিনজন শেরপা ওঁরা সঙ্গে এনেছিলেন। তার মধ্যে অসুস্থ আঙ তেম্বারকে গতকাল ফেরত পাঠান হয়েছে। পেম্বারেরও এই অবস্থা। উঠতেই পারছেন না। ওঁকে সঙ্গে নেবার তো কথাই ওঠে না, নামিয়ে দেওয়াও সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। বিপদটা এভাবে আসবে, কেউ ভাবতে পারেন নি। আর শেরপাদেব মধ্যে আছেন সবে ধন নীলমণি আঙ নিমা। কিন্তু তিনি আর কত বোঝা বইবেন।

হিলারী আর তেনজিং-এর সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা। হয় গোটা শিবিরটা নিজেদেরই কাঁধে ক'রে ব'য়ে নিয়ে যাওয়া, আর নয় এবারের মত ফিরে যাওয়া।

ফিরে যাওয়া? এত পরিশ্রম, এত অর্থব্যয় বরবাদ ক'রে শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে হবে? অসম্ভব। তেনজিং আর হিলারী ঠিক করলেন মাল তাঁরাই বইবেন।

তদনুযায়ী সমস্ত মালপত্র নতুন ক'রে বাঁধাছাঁদা করতে হ'ল। যেগুলো না নিলে একেবারেই নয়, মাত্র সেগুলোই তাঁরা নিলেন। এমন কি অক্সিজেনও কিছু তাঁদেরকে ফেলে রেখে যেতে হ'ল। সকাল আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে লোয়ে, গ্রেগরী আর নিমা অষ্টম শিবির ছেড়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ৯০ পাউণ্ড ক'রে মাল নিয়েছেন।

হিলারী আর তেনজিং তাঁদের জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে দশটার সময় রওনা দিলেন। ওঁদের পিঠে পঞ্চাশ পাউণ্ড ক'রে মাল

ছিল। ওঁরা খুব ধীরে ধীরে উঠতে লাগলেন। ঢালু বেয়ে উঠতে উঠতে একটা খাড়া চূড়ার নীচে এসে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ আগে এই পথ দিয়ে লোয়েরা এগিয়ে গেছেন। তাঁরা পাহাড়ের গায়ে যে ধাপ কেটে রেখে গেছেন তাইতে পা রেখে রেখে এঁরা স্বচ্ছন্দে উঠে গেলেন। চূড়ার উপরে যখন উঠলেন, তখন দুপুর। লোয়ে, গ্রেগরী আর আঙ নিমা সেখানে ব'সে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তেনজিং আর হিলারীও বোঝা নামিয়ে তাঁদের পাশে ব'সে পড়লেন।

ভারী সুন্দর জায়গাটা। গতবারে সুইসরা এখানে শিবির ফেলেছিল। চতুর্দিকের সৌন্দর্য দেখে অভিযাত্রীরা মুগ্ধ হলেন। হিলারী কয়েকখানা ফটোও তুললেন।

তারপর তাঁরা আবাব উঠতে লাগলেন। দেড়শ ফুট উঠে তাঁরা, হাণ্ট দুদিন আগে যে পর্যন্ত উঠেছিলেন, সেখানে পৌছলেন। হাণ্ট অনেক মালপত্র রেখে গেছেন। জায়গাটা ২৭৩৫০ ফুট উঁচুতে। কিন্তু ওঁরা ভাবলেন নবম শিবিরের জন্য আরও উঁচুতে ওঠা দরকার। তখনও খানিকটা ওঠবার ক্ষমতা সকলেইর আছে। হাণ্ট যে সমস্ত মালপত্র রেখে গিয়েছিলেন সেগুলি তাঁরা ভাগাভাগি করে নিয়ে উপরে উঠতে শুরু করলেন।

একটা খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে তাঁরা বেলা দুটো পর্যন্ত উঠলেন। একে একে সবাই ক্লান্ত হ'য়ে পড়তে লাগলেন। কোথাও এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। কোথাও শিবির ফেলা দরকার। ওঁদের বেজায় তেষ্টা পেয়েছে। জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গে'ছে। বুক ধড়াস ধড়াস করছে। কিন্তু কোথায় বিশ্রাম নেবেন? পাহাড়টা উঠে গেছে তো গেছেই। চূড়াটাই এখনও নজরে পড়ল না। আর কতদূর উঠতে হবে?

তেনজিং বললেন, আরো খানিকটা উঠলে পরে বাঁদিকে একটা পাহাড়ের খাঁজ পাওয়া যাবে। তিনি ল্যাম্বেয়ারের সঙ্গে গতবার এখানেই তাঁবু ফেলেছিলেন। অতি কষ্টে প্রায় আড়াইটে নাগাদ ওঁরা সেখানে পৌঁছলেন। হান্ট যেখান থেকে ফিরে গিয়েছিলেন, ওঁরা সেখান থেকে আরও সাড়ে পাঁচশ ফুট উপরে উঠেছেন। পরিশ্রম খুব হয়েছে। তবু সবাই খুব খুশী। ২৭৯০০ ফুট উঁচুতে নবম শিবির ফেলতে পারা গেল দেখে সবাই কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। কাল বিলম্ব না করে লোয়ে, গ্রেগরী আর নিমা নেমে গেলেন।

নবম শিবিরে ২৮শে মের শেষ রাত্রে ষ্টোভটা একটানা গর্জন করে চলেছে। একজোড়া বুট প্রায় গরম হ'য়ে এল। হিলারী ঘুমোবার ব্যাগ ছেড়ে তখনও বাইরে বের হননি। তেনজিং স্টোভটা আরেকবার পাম্প করে দিলেন। আগুনে জোর হ'ল। তিনি হাত দুটো বাড়িয়ে সেঁকতে লাগলেন।

ঘুমোবার ব্যাগের মধ্যে শুয়ে শুয়ে হিলারীর মনে হলো, তিনি জ'মে গেছেন। তাঁর পা দুটো প্রবল শৈত্যাঘাতে বোধ হয় পঙ্গু হয়ে গেছে। পর্বতারোহীদের কাছে এ-বিপদ নতুন নয়। এর আগেও অনেক অভিযাত্রীর, বহু শেরপার এ-দুর্দশা ঘটেছে। জন্মের মত কারো পা গেছে, কারো গেছে হাতের আঙ্গুল। দারজিলিঙ শহরে এরকম হতভাগ্যদের সাক্ষাৎ হামেশাই পাওয়া যায়। হিলারীর ভয় হলো। শুয়ে শুয়ে স্টোভের গর্জন শুনছেন— মনে পড়ছে বাড়ির কথা। বাইরে তুষার ঝড় চলেছে। তবে তার

গতিবেগ আগের তুলনায় ঢের কম। হিলারীর মনে পড়ল তাঁর দেশের--নিউজিল্যাণ্ডের পর্বতটার কথা। কতবার যে তাঁরা চূড়ায় উঠেছেন দলবল নিয়ে তার ঠিক নেই। কিন্তু এ হিমালয় সে পর্বত নয়।

কোথায় নিউজিল্যাণ্ড আর কোথায় হিমালয়ের দক্ষিণ 'কল', ভাবতেই হিলারির আশ্চর্য লাগল। দেশে ছিল মৌমাছির চাষ। সব ফেলে রেখে এভারেস্ট চড়তে এসেছেন তিনি। এভারেস্ট চড়ার স্বপ্ন তাঁর অনেকদিনের। এইত এভারেস্ট। তাঁবুর বাইরে অপেক্ষা করে আছে মাথা উঁচু ক'রে। সেই গর্বোদ্ধত শীর্ষ আজও অজেয়। এবারও কি অজেয়ই থেকে যাবে? হিলারীর মনে পড়ল তাঁর মায়ের কথা। আসবার সময় তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন, সফল হও। কোথায় কতদূরে তাঁর দেশ, তবু এখান থেকেই যেন উঁকি মেরে দেখা যায় তাঁদের রান্নাঘরখানা। মা পোষাকের উপরে অ্যাপ্রনখানা জড়িয়ে পছন্দসই খাবার বানাচ্ছেন-- আর বাবা, সেই একরোখা বৃদ্ধ পাইপ মুখে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তর্ক জুড়ে দিয়েছেন কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গে। তাঁকে বোঝাবে সাধ্য কার! বাবার কথা মনে পড়তেই হিলারীর খুব মজা লাগে। সত্যি, বুড়োরা বড় অবুঝ। তাঁদের কোনো কিছু বোঝানো এভারেস্টে ওঠারই সামিল। ভারতবর্ষে এসেও অবাক হয়েছেন হিলারী। এ বড় অদ্ভুত দেশ। একেবারে আলাদা দুনিয়া। প্রকৃতি যেমন খামখেয়ালী, তেমনি মানুষগুলো। হিলারীর হঠাৎ মনে পড়ল ছাতাটার কথা। ছাতা নিয়ে বেশ মজা হয়েছিল। কর্নেল হাণ্টের টেলিগ্রাম পেয়ে তোড়জোড় শুরু করছেন আসবার। মা এটা বাঁধেন সেটা কেনেন। হিলারীর

সে সবে ভ্রূক্ষেপ নেই। ছাতা ছাতা করে অস্থির হ'য়ে পড়লেন। এ দোকান সে দোকান তোলপাড় ক'রে শেষকালে একটা ছাতা পছন্দ হলো। কিনলেন। এদিকে শহর সুদ্ধ হৈ হৈ পড়ে গেছে হিলারীর ছাতা কেনা নিয়ে। বন্ধু বান্ধব চেনা পরিচিত সকলেরই এক প্রশ্ন, কি হে তোমার আবার ছাতার এমন কি দরকার পড়ল? হিলারীর এক জবাব এভারেস্টে যাচ্ছি। এভারেস্টে যাচ্ছ! গো টু এভারেস্ট! (এভারেস্ট যাবে!) সকলের চক্ষু ঊর্ধ্বগামী হলো। উইথ্ অ্যান্ আম্ব্রেলা! (ছাতা নিয়ে!) তাঁদের মুখের হাঁ প্রশস্ত হলো। কেউ কেউ টিপ্পনিও কাটলেন। তা কাটো, হিলারী মনে মনে ভাবলেন। বাছাধনদের তো আক্কেল নেই, পড়তে নেপালী বৃষ্টির গুঁতোয় তো বুঝতে বৃষ্টি কাকে বলে। হিলারীর মনে হলো তাঁর মা বাবা, বন্ধুবান্ধব কেউই উপলব্ধি করতে পারবে না, ওঁরা এখন কোথায় আছেন, কিভাবে আছেন। তাঁবু ফাঁক করলেই আকাশ দেখা যায়। আকাশ নয়, মেঘের স্তূপ। বাইরে অনবরত তুষার ঝরছে। সামান্য শব্দও এখন অন্য কিছুর বার্তা বয়ে আনে। এতো আমাদের প্রতিদিনের দেখা জগত নয়। এখানে সবই অদ্ভুত, সবই অপার্থিক। সেই অজানা পৃথিবীতে ছোট্ট এক তাঁবুর মধ্যে শুয়ে শুয়ে দুর্জন জানা-পৃথিবীর মানুষের একজন—হিলারী ভাবলেন, এই তো একটু পরেই তাঁদের চরম চেষ্টা শুরু হবে। এর আগে বুর্দিলোঁ আর ইভান্স ফিরে গিয়েছেন। তার আগে, তারও আগে বহু বহু জন ফিরে গেছেন। তাঁদের যেখানে শেষ, হিলারী আর তেনজিং-এর সেখান থেকে শুরু।

সে কথা হিলারীর ঠাণ্ডা বুটজোড়া গরম করতে করতে তেনজিং-এরও মনে পড়ল। গতবারেও তেনজিংকে ফিরে যেতে হয়েছে।

শেষ ৭০০ফুট আর কিছুতেই ওঠা গেল না। ল্যাম্বেয়ার কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। শৈত্যাঘাতে তাঁর পা অবশ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর পক্ষে আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু তেনজিং তখনও তাজা ছিলেন, তখনও তাঁর দম ছিল। তিনি এগিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন ল্যাম্বেয়ার বাধা দিলেন। বললেন, তেনজিং জীবন আগে, তারপরে এভারেস্ট। একার আমরা পরাজিত হয়েছি। ফিরে যাই চল। ওঁরা ফিরে এলেন। কিন্তু আফসোস থেকে গিয়েছিল তেনজিং-এর মনে। আবার তিনি ঘুরে এসেছেন। এবারে কি হবে? এবারেও কি পরাজিত হবেন? ফিরে যাবেন আকাঙ্ক্ষিতকে লাভ না করেই?

কর্নেল হাণ্টের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল, যদি সুস্থ থাকেন তবে তেনজিংকে এভারেস্টে উঠবার সুযোগ দেবেন। হাণ্ট সে চুক্তি রেখেছেন। তেনজিং কাঠমাণ্ডুতে এক খবরের কাগজের সংবাদদাতার কাছে বিবৃতি দিয়েছিলেন, 'যদি সুযোগ পাই এবার শেষ চেষ্টা করব। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।' করব না হয় মবব—এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা। দারজিলিঙ থেকে যাত্রা করবার সময় এক বাঙালী সাংবাদিক (শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র, আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদদাতা) তাঁর হাতে ভারতীয় জাতীয় পতাকা দিয়ে বলেছিল, "বন্ধু, এভারেস্টে যদি উঠতে পার, তবে আমার দেশের পতাকাটাও সেখানে উড়িও।" সে পতাকা তেনজিং-এর পকেটে আছে। তার সঙ্গে আরও তিনটি পতাকা আছে—বিশ্বরাষ্ট্র-সংঘের, নেপালের আর ব্রিটেনের। সমস্ত মানুষের প্রতিনিধি হ'য়ে পতাকা বহনের যে দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন, এবারেও কি তা পালন করতে পারবেন না?

এভারেস্ট এবারেও দূরে থেকে যাবে! সাহেবেরা বলে,

এভারেস্ট অভিযান। কিন্তু তেনজিং বৌদ্ধ। তাঁর অত গর্ব নেই। বাল্যকাল থেকে জেনে এসেছেন, ওই যে এভারেস্ট, চোমোলাংমা, যার মাথার উপর দিয়ে পাখীও উড়তে পারে না, সেখানে তাঁর ইষ্টদেবের বসতি। এভারেস্টে আসা তাই তাঁর কাছে জয়যাত্রা নয়, তীর্থযাত্রা। তবে এ তীর্থ মহত্তর তীর্থ। তেনজিং-এর কি তেমন ভাগ্য হবে না, সেই তীর্থের পবিত্র রেণু স্পর্শ করবার ?

অবশেষে গরম টরম ক'রে হিলারীর বুটজোড়া পরবার মত হলো। পুরো একটি ঘণ্টা এই কাজে ব্যয় হলো।

হিলারী বুটজোড়া পরতে পরতে বললেন, "তেনজিং, আমার মনে হচ্ছে ল্যাম্বেয়াবের মত আমার পাও অসাড় হয়ে গে'ছে।"

তেনজিং সাহস দিলেন, ও কিছু নয়। তারপর কফি বানালেন। কফির পর তাঁরা আবার একচোট পেটপুরে লেবুজল খেয়ে নিলেন। অভিযাত্রীদের কাছে লেবুজলের তুল্য প্রিয় জিনিস আর কিছু নেই। পাহাড়ে উঠতে তেষ্টা পায় প্রচুর। শুধু জল খেলে পেটে ব্যথা হয়। তাই তাঁরা লেবুজল আর চিনি খান। তেনজিং আর হিলারী যতটা পারলেন লেবুজল খেলেন। তারপর বোতলে ভ'রে সঙ্গেও কিছুটা নিলেন।

গত রাত্রে ওঁরা চার ঘণ্টা অক্সিজেন টেনেছিলেন। ঘণ্টায় এক লিটার ক'রে। রাত্রি ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত আব ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত। যতক্ষণ অক্সিজেন নিচ্ছিলেন, বেশ থাকছিলেন। অক্সিজেন ছাড়া ওঁদের খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল। রাত্রে এমনই ঠাণ্ডা পড়ছিল যে তাপমাত্রা শূন্যের নীচে আরও ষোল ডিগ্রি

নেমে গিয়েছিল। একটা মাত্র সুলক্ষণ যে বাতাসের বেগ কমতে কমতে ভোরের দিকে একেবারে প'ড়ে গেল।

ভোর চারটেয় আবহাওয়া অতি সুন্দর হয়ে দাঁড়াল। ভোরের আলোতে চূড়াগুলোয় রঙের মাতন সুরু হলো। নীচের দিকে তাকাতেই নজরে পড়ল অন্ধকার কি দ্রুতগতিতে নেমে যাচ্ছে। কোন গুহায় মুখ লুকোবে যেন তারই চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত। প্রায় ১৬,০০০ ফুট নীচে থায়াংবক মঠটা অন্ধকারকে ঢুঁ মেরে ফুটো ক'রে আলোর সাগরে ভেসে উঠল। মঠটা দেখে তেনজিং কি খুশী। হিলারীকে ডেকে দেখালেন।

হিলারী বললেন, "আমার পা এখনও ঠিক হয়নি। তেনজিং তুমিই আগে চল।"

তাই হলো। যাত্রা করবার আগে আবার একচোট সমস্ত জিনিষপত্র পরীক্ষা ক'রে নেওয়া হলো। দক্ষিণের পর্বত চূড়াটার কিছু নীচে পর্যন্ত তেনজিং আগে আগে চললেন, তারপর হিলারীকে এগিয়ে দিলেন। যিনি আগে যান তাঁকে বরফ কেটে ধাপ বানাতে হয়। কিন্তু পিছনে যিনি থাকেন, তাঁর দায়িত্বই বেশী। তাঁকে সমস্ত দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। দড়িদড়া ধ'রে আগের লোকটির ভাব সামলাতে হয়।

ভোর ঠিক সাড়ে ছটায় ওঁরা তাঁবু ছেড়ে বেরোলেন। তারপর ধীরে ধীরে এগুতে লাগলেন। বরফের মধ্যে পা ফেলায় অশেষ সাবধান হতে হয়। এক পা এগিয়েই বারবার জুতোর ঠোক্কর দিয়ে দেখে নিতে হয় জায়গাটা যথেষ্ট শক্ত কি না, শরীরের ভার সইবে কি না। ঠুকে ঠুকে নিশ্চিন্ত হ'লে তবে আরেকটি পা এগুনো। ২৮০০০ ফুট পর্যন্ত তেনজিং আগে চললেন। তারপর

হিলারী এগিয়ে গেলেন। এখান থেকে পাহাড়ের ধার একেবারে ক্ষুরের ফলার মত সরু হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে আরও কয়েক শ ফুট এগিয়ে যাবার পর তাঁরা অপেক্ষাকৃত চওড়া জায়গা পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

আরে একী! তাঁরা সেই জনমানবশূন্য দুর্গম পর্ব্বতে, এক গর্তের মধ্যে দু বোতল অক্সিজেন পেলেন। অক্সিজেন পাওয়া মানে জীবন পাওয়া। ইভান্স আর বুর্দিলোঁ এ পর্যন্ত এসেছিলেন। যাবার সময় অক্সিজেনের বোতল দুটো রেখে গেছেন।

বোতলের গা থেকে বরফ চেঁছে ফেলে হিলারী পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, ঠিকই আছে। যদি হিসেব ক'রে খরচ করেন তো দক্ষিণ 'কল্' পর্যন্ত পৌঁছাতে কষ্ট হবে না। হিলারী আর তেনজিং ওঁদের দুজনের দূরদৃষ্টিকে ধন্যবাদ দিলেন।

দক্ষিণ দিকের চূড়াটার শেষ ৪০০ ফুট ক্রমেই খাড়া হ'তে লাগল। এগিয়ে যাওয়া খুবই দুঃসাধ্য। তবুও এইটেই একমাত্র পথ। ওঁরা প্রাণান্ত পরিশ্রম ক'রে ধাপ কেটে কেটে অবশেষে বেলা নটায় উপরে উঠতে সমর্থ হলেন।

সামনেই এভারেস্ট। মহিমময় তাতে সন্দেহ নেই। সম্ভ্রমে তেনজিং আর হিলারীর মন পূর্ণ হ'য়ে উঠল। ওঁদের আতঙ্ক হলো পথের ভয়াবহ রূপ দেখে। ইভান্স আর বুর্দিলোঁ এ সম্পর্কে আগেই হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছিলেন। তবু এতটা যেন ওঁদের কল্পনায় ছিল না। ডান দিকে বিরাট বিরাট বরফের কার্ণিস ঝুঁকে রয়েছে। বরফগুলো যেভাবে ঝুলে পড়েছে তাতে মনে হয় হাজারো আঙুল যেন বিরাট হিংস্র থাবা বাড়িয়ে আছে। নাগালের মধ্যে পেলেই গলা টিপে ধরবে। ওই কার্ণিসের নীচেই অতলস্পর্শী

এক গহ্বর। পা ফস্কালেই একেবারে ১২০০০ ফুট নীচে কাণ্ডসুদ্ধ হিমবাহের উপর ধপ ক'রে পড়বেন। ওদিকে এগুনো মানেই নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে পা ফেলা।

এই বিরাট কার্নিসের বাঁ ধারে পাহাড়ের গা একেবারে খাড়াভাবে নেমে গেছে আরেকটা চূড়া পর্যন্ত। সেই চূড়াটা পশ্চিম কোন থেকে উঠেছে। উপর থেকে দেখে মনে হলো এদিকের বরফ খুব কঠিন হ'তে পারে। যদি ধাপ কেটে কেটে ওই চূড়াটায় পৌঁছান যায়, তবে কিছুটা এগুনো যেতে পারে।

এই সময় ওঁদের অক্সিজেনের প্রথম বোতলটি ফুরিয়ে গেল। ওঁরা খালি বোতল ফেলে দিয়ে নতুন বোতলে নাক লাগালেন। আর মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টা সময় হাতে।

হিলারী কুড়ুলের কোপ লাগালেন বরফের মধ্যে। ছিটকে পড়ল বরফের কুঁচি। হিলারী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বরফ বেশ শক্ত। দিব্যি পা রাখা যাবে। কুড়ুলটা বরফে গেঁথে ঝুলে পড়তেও বাধা হবে না।

তেনজিং জিজ্ঞাসা করলেন "কেমন মনে হচ্ছে?"

হিলারী বললেন, "খুব সুবিধের না।"

তেনজিং বিড়বিড় ক'রে বললেন, "ভালোই হোক আর মন্দই হোক এগিয়ে যেতেই হবে।"

তারপর ওঁরা একটু একটু ক'রে এগুতে লাগলেন। প্রথমে হিলারী ধাপ কাটতে কাটতে প্রায় ৪০ ফুট এগিয়ে যান। তেনজিং পেছনে দাঁড়িয়ে থাকেন হিলারীর দড়ি ধ'রে। হিলারী উপরে উঠে জায়গামত বেশ ক'রে দাঁড়িয়ে কুড়ুলটা বরফে পুঁতে দড়ি ঝুলিয়ে দেন, আর তেনজিং তাই ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে উঠে আসেন। পরের

বার তেনজিং এগিয়ে যান আর হিলারী অমনি ক'রে ঝুলতে ঝুলতে ওঠেন।

তাঁরা এক ঘণ্টা এই রকম ধাপ কাটতে কাটতে আর ঝুলতে ঝুলতে উঠলেন। এমনিভাবে উঠতে উঠতে হঠাৎ এক সময় তাঁরা দাঁড়িয়ে পড়লেন। আর এগুবার উপায় নেই। তাঁদের সামনে একেবারে খাড়া ৪০ ফুট উঁচু এক পাহাড়ের ধাপ। এই ধাপটা থায়াংবক থেকেই ওঁরা দূরবীণ দিয়ে দেখেছিলেন। তখনই বুঝেছিলেন এটা টপকাতে ওঁদের মুশকিলে পড়তে হবে। তবে সে মুশকিল যে এত বিরাট তা বুঝতে পারেন নি। এই পাহাড়ের বাঁ পাশে বিরাট এক বরফের স্তূপ। আর পাহাড় আর বরফের স্তূপের মধ্যে রয়েছে সরু এক ফাটল। হিলারী এক সাংঘাতিক ঝুঁকি নিলেন। না নিয়ে উপায় ছিল না। এই পাহাড়টা টপকাবার উপরই সব কিছু নির্ভর করছে। হিলারী তেনজিংকে দড়ি ধরতে ব'লে সেই ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তারপর অমানুষিক চেষ্টায় এক দেওয়ালে পিঠ আর অন্য দেওয়ালে হাত আর পায়ের চাপ দিয়ে দিয়ে টিকটিকির মত ইঞ্চি ইঞ্চি করে ৪০ ফুট উপরে উঠে গেলেন। তাঁর হাঁটু, পিঠ আর হাতের তালুতে বেদনা হলো। তিনি আর দাঁড়াতে পারলেন না। উপরে উঠেই কয়েক মিনিট নিঃসাড়ে শুয়ে রইলেন। এত কষ্টের পর এটুকু উঠতে পেরে হিলারীর মনে বল এল। বুঝতে পারলেন এবার তাঁরা সফল হবেনই। হিলারী উপর থেকে দড়ি ধরতেই তেনজিংও অমনিভাবে উঠে গেলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার তাঁরা উঠতে শুরু করলেন। পাহাড়টা তেমনি উঠে গেছে, ডান ধারে তেমনি বিরাট বিরাট বরফের কার্নিস ঝুলে আছে, আর বাঁ দিকে খাড়া নেমে গেছে

পাহাড়টা। ওঁরা ধাপ কাটছেন আর ধীরে ধীরে উঠছেন। যেন পাহাড়টা আর শেষ হবে না, যেন ওঁদের চলারও ছেদ পড়বে না।

হিলারী একবার অক্সিজেন দেখে নিলেন। ঠিক আছে। ওঁর ক্লান্তি আসতে লাগল। তেনজিং ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছেন সমানভাবে। যতবার হিলারীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়, ততবার তাঁর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ইশারা ক'রে হিলারীকে বলেন, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। কিন্তু আর কতদূর যেতে হবে? আর কতক্ষণ চলতে পারবেন তারা? শরীরের সামর্থ্য তো অক্ষয় নয়? অক্ষয় নয় অক্সিজেনের পুঁজি? কতক্ষণ ধ'রে যে তাঁরা চলেছেন, এখন আর বোধ হয় তাও মনে করতে পারেন না।

শুধু যেন অভ্যাসের বসেই তাঁরা উঠে যাচ্ছেন। আরো অনেকটা উঠতে হবে। উঠতে হবে! উঠতে হবে! উঠতে হবে! কিন্তু একী? তাঁদের কি দৃষ্টিবিভ্রম ঘটল? মরুভূমিতে মরীচিকা থাকে। এভারেস্টেও কি তাই এই দুজন অমিততেজা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অভিযাত্রীকে ছলনা করতে এসেছে।

বারবার তাঁরা চোখ বুজলেন, আবার চোখ খুললেন। একবার ইচ্ছে হলো চোখ থেকে 'সান গ্লাস'টা খুলে ফেলে ভাল ক'রে দেখতে। কিন্তু ভয় হলো। পরিষ্কার সূর্যের আলো শাদা বরফের উপর প'ড়ে ভয়ানক জেল্লা দিচ্ছে। চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। ও জেল্লা চোখে লাগলে সঙ্গে সঙ্গে চোখ অন্ধ হয়ে যাবে। তাই নীল চশমা চোখে দিয়েই বার বার চূড়াটার দিকে চেয়ে রইলেন। চূড়াটা তো আর উঠছে না। ঢালু হয়ে অন্যদিকে নেমে গেছে। তবে? তবে কি তাঁরা পৌঁছে গেলেন? পৌঁছে গেলেন এভারেস্ট শিখরে? পৃথিবীর সর্বোচ্চ শীর্ষে।

হ্যাঁ, ওই তো, অপর পারে, অনেক নীচে রঙবুক হিমবাহ। চূড়ার একধারটা চেপ্টা, অন্য ধারটা খাড়াই। তার উপরে দুজন দাঁড়িয়ে আছেন। ক্ষণকালের জন্য তাঁরা বিহ্বল হ'য়ে গিয়েছিলেন। সংবিৎ পেতেই তেনজিং আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন, "উঠেছি। আমরা উঠেছি।" হিলারী তো শুনতে পেলেন না। ওঁদের মুখে ছিল অক্সিজেনের মুখোশ। হিলারী তেনজিং-এর কথা শুনতে পেলেন না, তবে বুঝলেন। আকর্ণবিস্তৃত হাসি দিয়ে তেনজিংকে অভ্যর্থনা জানালেন। করমর্দন করবার জন্য হাতটা এগিয়ে দিলেন। তেনজিং হিলারীকে গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন।

এ কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন তেনজিং? এভারেস্টের চূড়ায়? পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরে? তাঁর পদতলে গোটা বিশ্ব? সেই ধ্যান-গম্ভীর পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে তাঁর মন বিস্ময়ে পূর্ণ হলো, সম্ভ্রমে ঝুঁকে পড়ল মাথা।

এই এভারেস্ট-শিখর! এই তাঁর শৈশবের স্বপ্নস্থল! কিন্তু এ তো শুধু মাত্র পাহাড় নয়। এ যে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন বিরাট পুরুষ, পৃথিবীর আত্মা। এই কি ধ্যানী বুদ্ধ! প্রভু তথাগত! ওই যে নীচে, নীচে আরো নীচে, অজস্র, অসংখ্য, অগণ্য পর্বতরাশি ওরাই তো সেই তেনজিং-এর শৈশবে বাল্যে মা ঠাকুমার মুখে শোনা দেবদেবীগণ। কি শান্ত, কি গম্ভীর, কি বিরাট। হে দেবতা, হে সাগরমাতা, যদি আমাদের কলঙ্কী পদস্পর্শ তোমাদের অপবিত্র ক'রে থাকে তো অবোধজ্ঞানে, সন্তানজ্ঞানে আমাদের মার্জনা করো। হে তথাগত, হে শান্ত, হে মহাধ্যানী, যদি অজ্ঞাতসারে তোমাদের ধ্যান-ভঙ্গ ক'রে থাকি, আমাদের মার্জনা করো। হে বিশাল, হে বিরাট, হে মহামহিম, মানুষের দুর্জয় সাহস আর দুর্দম উৎসাহ তোমার কাছে

নৈবেদ্য এনেছি। গ্রহণ করো। তেনজিং-এর সমস্ত অন্তর লুটিয়ে প'ড়ে প্রার্থনা জানাল।

তেনজিং পকেট হাতড়িয়ে যা পেলেন তাই ইষ্টকে নৈবেদ্য দিলেন পকেটে বিশেষ কিছুই ছিল না, ছিল কিছু বিস্কুট, কিছু মিছরী, চকোলেট আর--

আর একটা ছোট্ট নীল পেন্সিল।

ছোট্ট পেন্সিলটা দেখে তেনজিং-এর বাড়ির কথা মনে পড়ল। দারজিলিং থেকে আসবার সময় তাঁর ছোট মেয়ে নীমা এই পেন্সিলটা তার হাতে গুঁজে দিয়েছিল। কানে কানে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলেছিল, বাবা ছে মো' লাংমায় তথাগত থাকেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে, এটা দিও, ব'লো আমি দিয়েছি।

কতদিন পরে তেনজিং-এর মনে প'ড়ল নীমার মুখ। আরেক মেয়ে পেমপেম আর স্ত্রী আংলুমার চেহারাটাও চোখে ভেসে উঠল। থায়াংবক ছাড়বার পর তেনজিং সমস্ত কিছুই ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তায় শুধু একজনের স্থানই ছিল, সে এভারেস্ট। এখন বাড়ির কথা মনে হ'তেই ফেরার কথা মনে পড়ল। ফেরবার কথা মনে হ'তেই পথের কথা মনে হলো। কি সাংঘাতিক পথ! সে পথে ওঠা যত কঠিন নামা তার চেয়েও বেশী কঠিন। এই প্রথমবার তেনজিং-এর আতঙ্ক হলো। নামতে পারবেন তো? ফিরে যেতে পারবেন লোকালয়ে?

এভারেস্টে শেষ পর্যন্ত উঠতে পেরেছেন ভেবে হিলারী ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। এত কষ্ট, এত পরিশ্রমের অবসান শেষ পর্যন্ত ঘটল। কি স্বস্তি। হিলারী নিশ্চিন্ত হলেন। চারিদিকের দৃশ্য কি অপূর্ব। হিলারী মুগ্ধ হলেন। দেখলেন তেনজিং আত্মহারা

হ'য়ে গেছেন। তাঁর আত্মহারা হ'লে চলবে না। ঘড়ি দেখলেন। বেলা সাড়ে এগারটা। তারিখটা মনে করলেন। ২৯শে মে। অক্সিজেন পরীক্ষা করলেন। দেখলেন, অক্সিজেন যা আছে তাতে পনর মিনিটের বেশী এখানে থাকা যাবে না। এরই মধ্যেই তাঁর যা করবার, যথাসম্ভব ক'রে নিতে হবে।

এভারেস্টের উপরটা একদিকে চেপ্টা, অন্যধারটা উঁচু। উত্তর দিকে শুধুই বরফ, দক্ষিণ দিকে পাথর। আর পশ্চিম দিকটাতে নরম ববফ আর কঠিন পাথবেব মেশামেশি ক'রে আছে। জায়গাটা অপরিসর। দুতিনজন কোনরকমে দাঁড়াতে পারে। তবে বিশ ত্রিশ ফুট নীচে বেশ খানিকটা চওড়া জায়গা আছে। সেখানে চেষ্টা চরিত্র ক'রে দুজনের শোবার মত একটা তাঁবু খাটান যেতে পারে।

হিলারী অক্সিজেনের নল নাক থেকে খুলে ফেললেন। তারপব ক্যামেরা বের ক'রে চারধারের ফটো তুলতে লাগলেন। তেনজিং তাঁর কুড়ুলে চারটে পতাকা বেঁধে, কুড়ুলটা তুলে ধরলেন। পত পত ক'রে উড়তে লাগল রাষ্ট্রসঙ্ঘ, ভারত, নেপাল আব ব্রিটেনেব পতাকা। বাতাসের বেগ তখন ঘণ্টায় কুড়ি মাইল।

ছবি ভাল উঠবে কিনা, হিলারী বুঝতে পারছিলেন না। এই জাব্বাজোব্বা প'রে কি ফটো তোলা যায়? তিনটে করে দস্তানাই পরতে হয়েছে হাতে। দুটো পশমের, তার উপরে আবাব একটা বাতাস-প্রুফের। ক্যামেরা ভাল ক'রে ধরতেই পারছিলেন না। যা হোক, কোনও রকমে এভারেস্টের মূল চূড়া, দক্ষিণ চূড়া, ধারে কাছের অন্যান্য চূড়াগুলোর ছবি নিলেন। হঠাৎ তাঁর ঝিমুনি আসতে লাগল, শরীর এলিয়ে পড়তে লাগল। হিলারী বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি অক্সিজেন নাকে দিলেন।

এইবার নামতে হবে। যা অক্সিজেন আছে, তা হিসাবে করে খরচা করতে হবে। দক্ষিণ চূড়াটার গোড়ায় তাঁরা ইভান্স আর বুর্দিলোঁর বোতল দুটো রেখে এসেছেন, সে পর্যন্ত যে ক'রেই হোক এই অক্সিজেনেই চালাতে হবে।

ওঁরা নামতে লাগলেন। আগে নামছেন হিলারী। পেছনে শক্ত ক'রে দড়ি ধ'রে তাঁর ভার সামলাচ্ছেন তেনজিং! উঠবার সময়কার মাদকতা আর নেই। সমস্ত শরীর ক্লান্ত! তবু হুঁশিয়ার। খুব হুঁশিয়ার। পা টিপে টিপে নামো। অসতর্ক হয়েছ কি মৃত্যু। পা ফস্‌কেছে কি নিশ্চিহ্ন। ওঁরা ধীরে ধীরে ঝুলে ঝুলে নামতে লাগলেন।

এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁরা সবচেয়ে দুর্গম জায়গাটা পার হ'য়ে ক্ষণকাল বিশ্রাম নিতে দাঁড়ালেন। পেটপুরে লেবুজল খেয়ে একটু আরাম বোধ করলেন। একবার পিছন ফিরে সেই বিভীষিকাময় বিরাট বিরাট বরফের কার্নিশগুলো দেখে নিলেন। অজস্র অতিকায় বরফের আঙুলগুলো কি হিংস্রভাবে ওৎ পেতে আছে। ওঁরা যেন এভারেস্টের সদাসতর্ক প্রহরী। সুযোগ পেলেই অভিযাত্রীদের টুঁটি টিপে ধ'রবে বলে তৈরি হয়েই আছে। কিন্তু বিদায় বন্ধু। এ যাত্রা আর তোমাদের সুবিধে হলো না। তোমাদের এলাকা পেরিয়ে এসেছি! এক পা দু পা তিন পা—ওঁরা নামছেন তো নামছেনই। এক এক পা নামা মানেই জীবনের দিকে, লোকালয়ের দিকে, পরিবারের দিকে, স্নেহ মমতা প্রেম ভালবাসার দিকে এগুনো। ওঁরা দক্ষিণ চূড়ায় পৌঁছে গেলেন। অক্সিজেনের বোতল দুটো নিয়ে আবার শুরু করলেন নামা। চকিতে একবার তেনজিং-এর মনে পড়ল ল্যাম্বেয়ারের কথা। তেনজিং ল্যাম্বেয়ারকে কিছুতেই ভুলতে

পারেন না, এত বড় বন্ধু তাঁর আর কে আছে? যে বুট জোড়া প'রে আছেন তা ল্যাম্বেয়ারের দেওয়া। যে লাল স্কার্ফটা তাঁর গলায় সেটা ঠিক একবছর আগে, (২৮শে মে, ১৯৫২), দক্ষিণ চূড়াটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ল্যাম্বেয়ার তাঁকে দিয়েছিলেন।

শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিপর্যস্ত দেহ ছুটোকে টানতে টানতে বেলা ছুটোর সময় তাঁরা ছুজন নবম শিবিরে পৌঁছলেন। এর মধ্যেই তাঁবুটার কি অবস্থা হয়েছে! বরফে প্রায় ঢেকে গেছে। বাতাসের ঘায়ে কয়েকটা জায়গা ছিঁড়ে গেছে। উড়ছে পত পত ক'রে। যাকগে, এখন আর ওসব দেখবার সামর্থ্য নেই। এখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে আজই দক্ষিণ 'কল্'-এর শিবিরে পৌঁছতে হবে। সেখানে লোয়ে আছেন উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায়। নয়েস আছেন। আর আছে আশ্রয়, অভয় সাহায্য।

তেনজিং স্টোভ জ্বেলে লেবুজল তৈরি করলেন। তার সঙ্গে চিনি মিশিয়ে এক একজন আকণ্ঠ পান করলেন। হিলারী অক্সিজেন বদল ক'রে নিলেন। তারপর সেই শিবিরে যে সব জিনিসপত্র ছিল—ঘুমবার ব্যাগ, বাতাস ভরা তোষক—সে সব ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিলেন। তারপর বোঝা পিঠে নিয়ে টলতে টলতে আবার নামতে শুরু করলেন।

সুইস্‌দের শিবির ছাড়াতেই পড়লেন প্রবল বাতাসের ঝাপ্‌টার মধ্যে। এক একটা ঝাপ্‌টা আসে আর ওঁদেরকে যেন পিষে ফেলবার চেষ্টা করে। বিপদেব উপর বিপদ, যে পথটা ওঁরা বানিয়ে রেখে গিয়েছিলেন, বাতাসের ঝাপ্‌টায় আর বরফের গুঁড়োয় তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ওঁদের আবার পথ কাটতে হবে। প্রথমে হিলারী পথ কাটতে শুরু করলেন। ২০০ ফুট এগুবার পর তাঁর

দম ফুরিয়ে গেল। তখন তেনজিং শুরু করলেন! ১০০ ফুট এগুবার পর নরম তুষারের বিস্তীর্ণ এক তরঙ্গভূমি পড়ল। অতি সাবধানে তাঁরা সেটা পার হলেন।

অষ্টম শিবির থেকে নয়েসই প্রথম ওঁদের দেখতে পেলেন। তিনি আর লোয়ে ওঁদের দুজনকে অভ্যর্থনা করবার জন্য প্রায় ৩০০ ফুট এগিয়ে গেলেন। তাঁরা গরম সুপ্ ার অক্সিজেন সঙ্গে এনেছিলেন। তেনজিং আর হিলারী এতই পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন যে, তাঁদের কথা সরছিল না। তারপর ঢক ঢাক ক'রে গরম সুপ্‌টুকু গলাধঃকরণ করে ফেললেন। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন শিবিরের দিকে। তেনজিং শুধু ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলে ধ'রে বোঝালেন, তাঁরা উঠতে পেরেছেন। নয়েস আর লোয়ের মুখ খুশিতে ভ'রে উঠল।

বাইরে তখন তুষার-ঝড় আরম্ভ হয়েছে। তেনজিং আর হিলারী পিঠের বোঝা নামিয়ে তাঁবুর ভেতরে গেলেন। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে ঘুমবার ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তুষার-ঝড়ের বেগ বেড়ে উঠল। প্রচণ্ড আক্রোশে তাঁবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল! তাঁবুর কাপড়ে ঝড়ের ধাক্কায় হিমালয় যেন হা হা হা করে বুকফাটা আর্তনাদ ছড়িয়ে দিল। তেনজিং আর হিলারী পরাজিত হিমালয়ের সেই হিংস্র, তীব্র আর্তনাদ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লেন পরম নিশ্চিন্তে। আশঙ্কার রাজত্ব, দুর্ভাবনার এলাকা তাঁরা পার হ'য়ে এসেছেন। আর ভয় কিসের? আজ বিশ্রাম। কাল যাত্রা। এখান থেকে থায়াংবক, থায়াংবক থেকে নাম্‌চেবাজার, নাম্‌চেবাজার থেকে বিজয়ীর মত, শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহীর গৌরব ব'য়ে নিয়ে কাঠমাণ্ডু! তারপর দিল্লী, কলকাতা, সারা পৃথিবী।

*　　　*　　　*

সমস্ত পৃথিবী তেনজিং আর হিলারী আর কর্নেল হাণ্টের দলকে অভিনন্দিত করেছে, জয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছে। আবার কার গৌরব বেশী, তেনজিং-এর না হিলারীর। কে আগে উঠেছেন, তেনজিং না হিলারী -তা নিয়ে ঝগড়া করেছে। সাহেবেরা তেনজিংকে কোণঠাসা করবার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতীয়েরা, নেপালীরা, এশিয়াবাসীরা হিলারীকে স্বীকার করতেই চাননি। এই দুটো ব্যাপারেই তেনজিং খুব দুঃখ পেয়েছেন। কলকাতায় যখন এসেছিলেন, যখন বাইরে গিয়েছিলেন, তখন অনেকবার এই প্রশ্নের মুখোমুখী তাঁকে হতে হয়েছে, এভারেস্টে কে আগে উঠেছে ?

তেনজিং সমস্ত প্রশ্নের নিরসন করেছেন এক উত্তর দিয়ে, "আপনারা দড়িটাকে মনে রাখবেন। এক দিকে বাঁধা ছিলেন হিলারী অন্যদিকে বাঁধা ছিলাম আমি। ওই দড়িটাই হলো পৃথিবীব মানুষের দুর্দম আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ! আমি আর হিলারী দুটো বিছিন্ন সত্তা নই, সমগ্র মানবসত্তার দুটো অংশমাত্র। কে এভারেস্টে আগে উঠেছে ? মানুষ। এ ছাড়া অন্য জবাব আব আমার নেই।"

লেখক-পাঠক সংবাদ

উৎসাহী পাঠক প্রশ্ন করেন, আচ্ছা, এই যে আপনারা যা লেখেন, এসব কি সত্যি ? যে সব ঘটনা পাই আপনাদের লেখায়, সে সবের কি অস্তিত্ব আছে ? ঘটে কি তা আমাদের জগতে ? না কি ওসব কাল্পনিক ? না কি ওসব বাড়ানো ফাঁপানো কথা ?

প্রশ্ন শুনে লেখক মশাই প্রথম প্রথম বুঁদ হ'য়ে থাকেন। কিন্তু অধিকক্ষণ তো আর তুরীয় অবস্থায় থাকা চলে না। ধাতস্থ হতেই হয়। তাই দু-কথা বলতেও হয়।

তাই তিনি মৃদু হাসেন। একটু কাশেন। তারপর গলা ঝেড়ে বললেন,—সব কিছুই নিছক কল্পনা, তা বলি কি করে ? কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই, মগজে তা' দিলুম, আর স্টুট-স্টুট করে পাত্র-পাত্রী, স্থান-কাল, পরিবেশ সব সৃষ্টি হ'য়ে গেল, তাই বা বলি কি করে ?

আবার, যা যা দেখছি, যেমন যেমন দেখছি জগতে, যা কিছু ঘটছে তা সব খপ্ করে ধরছি, কথার জালে বাঁধছি, আর ঝোলায় পুরে আপনাদের সামনে হাজির করছি, তাও তো বলতে পারিনে !

তা হ'লে, দাঁড়াল কি !

লেখকের জবাব শুনে পাঠক কিছু হতভম্ব। তাহ'লে ? যা লেখেন তার অস্তিত্ব বাস্তবেও নেই, কল্পনাতেও নেই ?

না, না, লেখক এবারে নিজের পিঁড়িতে জেঁকে বসেন। তাঁর

আসনের তলে এবার শক্ত মাটি ঠেকেছে। বলেন, না না। বরং ঠিক তার উল্টো। নিছক শূন্য থেকে কিছু কি পাওয়া যায়? যা আমরা সৃষ্টি করি তার কিছু বাস্তব, আর কিছু কল্পনা।

বাংলা সাহিত্যে যে ছোকরা ডিগ্রী নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য ঢুকেছে, অচেনা আলোচনায় এতক্ষণ সে যোগ দেয় নি। মুখটি বুজে বসে ছিল। লেখকের মন্তব্যে সে যেন এতক্ষণে চেনা মানুষের দেখা পেলে। সোৎসাহে বলে উঠল, বুঝেছি, কবি যাকে বলেছেন অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।

লেখক পিঠ থাবড়ে বললেন, সাব্‌বাস্‌। বাহাদুর খেলোয়াড় তো তুমি! একটি শটে ভাবের গোলে বুদ্ধির বলটি ঢুকিয়েছ। বলিহারী।

গৃহকর্ত্রী এতক্ষণ চা-টা-আসটার তদাবক করছিলেন। মুখ ফিরিয়ে মাঝে মাঝে হাই তুলছিলেন। অভ্যাগত এক মেয়ে-কলেজের অধ্যাপিকার মানতাসাটি মাঝে মাঝে নেড়ে-চেড়ে দেখছিলেন। প্যাটার্ণটা বেশ পছন্দ হয়েছে। তাই মনোবাসনা অনেকক্ষণ থেকে থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। তার ওজনটা কত জানতে। ইচ্ছে ছিল, ফিসফিস করেই জেনে নেবেন। কিন্তু সর্দিতে গলা বসে গিয়েছিল।

আওয়াজটা তাই একটু জোরেই বেরুল, এর কতটা সোনা, কতটা খাদ জানেন!

বড়লোক গিন্নী তাঁর কথাতেই কান দিয়েছেন ভেবে লেখক তো আহ্লাদে আটখানা।

কললেন, আজ্ঞে সেইটে বলা মুস্কিল। জীবন যদি পাকা সোনা তো শিল্প সাহিত্য গহনা। কারিকুরি ফোটাতে হলেই তাতে খাদ মেশাতে হবে। কল্পনার খাদ। তবে কতটা মেশাতে হবে, তা

নির্ভর করছে কারিগরের কেরামতির উপর। এর কোন বাঁধা হিসেব নেই তো।

বাড়ীর কর্তা গিন্নীর সাহিত্যবোধের হদিশ পেয়ে খুব খুশী। নাঃ, গিন্নী আর গেঁয়োটে নেই। খুশী হ'য়ে হেঁ হেঁ করতে লাগলেন। গিন্নী খুশী। লেখকও। উভয়েই ভাবলেন কর্তা তাঁকেই তারিফটা দিলেন বুঝি। গিন্নী লেখকটেখকদের এই কারণেই পছন্দ করেন। দরকারের সময় ম্যানেজ ওরা করতে জানে। খুশী হয়ে জাপানী পট থেকে খানিকটা চা লেখকের কাপে ঢেলে দিলেন। উৎসাহিত হয়ে লেখক আরও একটা চতুর কথা, একটা সুন্দর "অকেশান-ফিটিং"-উপমা মগজ থেকে ঠেলতে ঠেলতে জিভের ডগায় এনে ফেলেছেন—সেটি কায়দা করে ওগরাতে যাবেন, এ হেন সময় বাংলা পড়ুয়া ছাত্রটি ত্থম করে এক প্রশ্ন করে, দিলে তার বারটা বাজিয়ে।

পড়ুয়াটি বললে, আচ্ছা, আপনাদের দৃষ্টি আর সৃষ্টির মধ্যে ফারাকটা কত?

লেখক কিঞ্চিৎ বিরক্ত হলেন। বেয়াড়া প্রশ্নটার জন্যে নয়, কষ্ট করে জুটিয়ে আনা উপমাটা এ যাত্রা আর কাজে লাগাতে পারলেন না বলে। ওটাকে ভবিষ্যতের শিকেয় তুলে রেখে গম্ভীর হয়ে বসলেন।

প্রশ্নটার মানে বুঝতেও একটু সময় লাগল। তবে দৃষ্টি আর সৃষ্টি, এই শব্দ দুটো তাঁর কানে ঝঙ্কার তুলল বেশ। দৃষ্টি আর সৃষ্টি, লেখক মনে মনে ভাবলেন, ছোকরা ঝেড়েছে বেশ। বড়ি জোর।

কিন্তু লেখক দমবার পাত্তর নন। এমন মহড়া বহু নিয়েছেন। একটু প্যাঁচ কষলেন। একটা চতুর কথা মনে পড়েছে তাঁর।

বললেন, বলেছ বেশ। তবে জিনিষটা তলিয়ে বোঝনি ভাই। ফারাকটা দৃষ্টির সঙ্গে সৃষ্টির নয়। দৃষ্টির সঙ্গে চোখের। দৃষ্টি না থাকলে সৃষ্টি তো হবেই না।

খাসা বলেছেন। (জয় বাবা অবন ঠাকুর! খুব বাঁচালে এ যাত্রা।) ছোকরা এতেই কাৎ। আড় চোখে লেখক দেখলেন, ছোকরার মুখে বেশ শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠেছে। এবারে তাই তিনি আরেকটি মোক্ষম চাপান দিলেন।

বললেন, চোখ থাকে সকলের, কিন্তু দৃষ্টি থাকে ক'জনের? কুরু-পাণ্ডবে মিলে কত ভাই ছিল জানো? এ'কশ পাঁচ। তাঁদের চোখ ছিল সকলেরই। কমসে কম দু'শো দশ জোড়া। কিন্তু দৃষ্টি ছিল একা শুধু অর্জুনের। তাই স্বয়ম্বর সভায় বাজী তিনিই মাৎ করলেন। যে দৃষ্টির বলে অর্জুন টকাস ক'রে লক্ষ্যটি বিদ্ধ করেছিলেন, তাকে দৃষ্টিই বলে না, তাকে বলে দিব্যদৃষ্টি। শিল্পী সাহিত্যিক কবি ভাবুক, প্রত্যেকেরই এই দিব্যদৃষ্টি থাকে।

এ যার নেই তার চরণ মিলিয়ে মিলিয়ে মাথায় টাক পড়িয়ে ফেললেও কবিতা বেরুবে না। তার দ্বারা সৃষ্টি হবে না কিস্সু। বড় জোর—

"হে বালক! মাঠে গিয়ে দেখে এস তুমি
কত কষ্টে চাষা লোক চষিতেছে ভূমি॥
পরিপাটি করি মাটি হ'য়ে সাবধান,
তবে তায় শস্য হয় ছোলা মুগ ধান॥"

(কোটেশান অবধি ঝেড়ে দিলেন একটা! অ্যাঁ! লেখকের এবার আফশোস হচ্ছে। এই মওকায় যদি রবীন্দ্র স্মৃতিসভা, কি

সংস্কৃতি মূলক কোনও অনুষ্ঠানের সভাপতি কি 'চিপগেষ্ট' হতে পারতেন তো একহাত দেখাতে পারতেন। এদের সামনে এসব বলা না ভস্মে হরিণঘাটার ঘি ঢালা ? আঃ !)

অক্ষর গুণে, চরণ মিলিয়ে একটা বস্তু খাড়া করলে বটে। কিন্তু সে চরণে নৃত্যের ছন্দ ফুটলো না, নূপুরের কিঙ্কিনী বেজে উঠলো না। শোনা গেল শুধু মিলিটারী বুটের পা মলানো ধুপধাপ। এখানে চোখ আছে বুঝতে পারি, কিন্তু দৃষ্টি নেই, দিব্যদৃষ্টি নেই। বাস্তব তাই বাস্তব হয়েই রইল। এই লাইন মেলান পদ্য ছোলা মুগ ধানের-বস্তাবন্দী হয়েই ব্যাপারীর গুদোমে গিয়ে উঠল। রসিকের আসর ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

কিন্তু কবি যে, ভাবুক যে, স্রষ্টা যে, দিব্য দৃষ্টি আছে যার, সে কি কাণ্ড ঘটায় দেখুন।

লেখক একটু থেমে, চোখ বুজে আবৃত্তি করলেন,

'ওপারেতে কালো রং, বৃষ্টি পড়ে, ঝম ঝম
এপারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুকটুক করে
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।'

কি ?

শোনামাত্র মেঘের কালো, ঝম ঝম বৃষ্টির ধারা, আকাশ- লঙ্কা গাছ আলো করা লাল-চোখের সামনে ভেসে উঠল, কি না ? গুণ-বতী এক ভাইয়ের জন্যে মন সিন সিন একটা ভাব, একটু বেদনার আভাস ফুটল কিনা ? এরই নাম লক্ষ্যবেধ। এরই নাম বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার খাদ মেশান।

সোনার তালটি নিছক বস্তু। কিন্তু সেই সোনায় গড়া গহনাটি সৃষ্টি। সোনার তাল থেকে গহনায় এই যে রূপান্তর, এইটেই হল

অতিরঞ্জন। তেমনি মানুষের বেলাতেও ঐ ব্যাপার। বাস্তবের মানুষ যখন কাহিনীর চরিত্র হয়ে ওঠে, দুয়ে কিছু তফাৎ ঘটে। এই ফারাকটি ঘটায় কল্পনা। শুধু কাব্যেই নয়, শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে অভিনয়ে সর্বত্রই এইভাবে খাদ মেশান হচ্ছে। এটা প্রয়োজন।

লেখকের কথার পানসি এতক্ষণে পালে ছুটেছে, কার সাধ্য রোধে তার গতি। উঁহুঁ, উপমা ঠিক হলনা। বরং বলা যায় বাক্যির ধান মুখের খোলায় তপ্ত হয়ে খই ফুটছে।

লেখক বলছেন, এখন কথা হচ্ছে দৃষ্টি কেন চাই? না, যাচাই-বাছাই-এর জন্য।—মহাভারতের এ গল্প তো সবাই জানেন। বিস্তারিত বলা বাহুল্য। দ্রোণাচার্য কুরুপাণ্ডব একশ পাঁচ ভাই-এর মধ্যে একশ চারজনের কাছ থেকেই জবাব পেলেন, তাঁরা গাছ, ডালপালা পাখীর সর্বাঙ্গ প্যাঁট-প্যাঁট করে দেখতে পাচ্ছেন। গুরু দ্রোণ বললেন, বুঝেছি বাপসকল, এবার ঘরে যাও। শুধু অর্জুন বললেন তিনি পাখীর মাথা, না পুরো মাথাও নয়,—পাখীর চোখটি ছাড়া আর কিছুই দেখছেন না। তখন আচার্য খুশী হয়ে বললেন, বৎস তোমারই শুধু দৃষ্টি আছে। তবে এবার ভেদ কর। দৃষ্টি দরকার এই বাছাইয়ের জন্য। সাহিত্য বলুন, শিল্প বলুন, সৃষ্টি করতে হলে, শুধু ঐ চোখটুকুই দেখতে হবে।

সাহিত্যকর্মের মালমসলা চাই? বেশ তো, গোটা জীবন পড়ে আছে, গোটা জগৎ পড়ে আছে। কি তোমার লক্ষ্য? কি ফোটাতে চাও? দ্যাখ। বাছাই কর তা থেকে। যাচাই কর তাকে। তার মধ্য দিয়ে, ভাব রূপের প্রতিষ্ঠা পাবে কি না, দ্যাখ। তারপর লেগে যাও প্রকাশ করার কাজে।

এই প্রকাশের ব্যাপারেই যত কারিকুরি। এইখানেই তো কারিগরের যত বাহাদুরী, পাঠকের মনে চরিত্রকে দাগ কেটে বসিয়ে দিতে হ'লে, ঘটনাকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতে হবে তার চোখে। কাজেই অতিরঞ্জন তো কিছু হবেই। সাহিত্য তো জীবনের শুধুমাত্র প্রতিলিপি নয়। তাই সাহিত্যের মাকে ছেলের শোকে একটু গলা ছেড়ে কাঁদতেই হয়।

এক দমে এতটা দৌড়ে লেখক হাঁফ ছাড়তে একটু থামলেন। আর ঘরের দিকে চেয়ে বেশ একটু দমে গেলেন। যেটুকু উৎসাহ ঘরে ছিল তা কখন উপে গেছে। কর্তা ঝিমুচ্ছেন। গিন্নী অধ্যাপিকার কানে কানে নিবিষ্ট চিত্তে কি বলছেন। অধ্যাপিকা ক্লান্তিতে শোফায় এলিয়ে পড়েছেন। বাংলা পড়ুয়া ছোকরাটি জানলার ধারে সরে গিয়ে অন্যঘরে পাঠরতা কর্তার মেয়েটিব দিকে নিষ্পলক চেয়ে রয়েছে।

আর পাঠক?

পাশের টেবিল থেকে তিনি একখানি সিনেমা পত্রিকা তুলে নিয়ে এ সপ্তাহের তারকা-যুগলের ঘরকন্নার বিবরণে ডুবে গেছেন! আর মনে মনে লেখকের চৌদ্দপুরুষের মুণ্ডপাত করে বলছেন —এই লেখক শালারা প্রত্যেকেই এক একটি বক্তিয়ার খিলিজি! চান্স পেলেই বক বক বক, কানে খিল তুলেও রেহাই নেই। উঃ!

লেখকেব মুখ দিয়ে আর বাক্য সরল না তাঁর উৎসাহের চাকা হঠাৎ যেন আলপিনেব খোঁচায় পাঞ্চার হয়ে গেছে।

এতক্ষণ লেখকের পাশে বসে বসে সব শুনছিলুম। লেখকের অবস্থা দেখে বড় মায়া হল। বেচারী!

ফিস ফিস করে বললুম, কিহে, থামলে কেন? বেশ তো চলছিল। শেষ কর প্রসঙ্গটা।

লেখকের বুদ্ধির গোড়ায় এতক্ষণে জল পড়ল ! বিজ্ঞের হাসি একটা ছাড়লেন।

পাঠকের দিকে, কর্তার দিকে, গিন্নীর দিকে গোটা ঘরের দিকে আড় চোখে চেয়ে বললেন, ঢের নেচেছি দাদা, আর নয়। এবারে বাড়ীর ছেলে বাড়ী ফিরি চলুন।

—শেষ—